আন্দামানে দশ বৎসর

মদনমোহন ভৌমিক

লেখক সমবায় সমিতি
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৫ আগস্ট ১৯৫৮

প্রকাশক
লেখক সমবায় সমিতির পক্ষে
রূপক গুহ
ই-৯২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রক
নবদ্বীপ বসাক
পাবলিসিটি কনসার্ন
৩ মধু গুপ্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : প্রদীপেন্দু দে

ভূমিকা

"আন্দামানে দশ বৎসরের" লেখক শ্রীমান মদনমোহন ভৌমিক আমাকে তাহার পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নানা কারণে তাহার এই দাবী অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য ; তাই এই ভূমিকারূপে কয়েকটি কথা বলিতেছি। বয়সে আমার থেকে বহু কনিষ্ঠ হইলেও আমার কর্মোদ্যমের প্রায় প্রথম অবস্থা হইতেই শ্রীমান মদনমোহন আমার সহকর্মী-গণের এবং আমার কর্মপথের সহায়কগণের অন্তর্ভূক্ত ছিল ; এবং সেই কর্মপথে অগ্রসর হইতে থাকিয়াই বহু আপদ-বিপদ কারা-যন্ত্রণা, নির্বাসন, অপমান প্রভৃতি ভোগ করিয়াও দেশপ্রীতি ও দেশহিত ব্রতে স্থিরচিত্তে অবিচলিত রহিয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিতই সর্বরূপ বাধা, বিঘ্ন, লাঞ্ছনা প্রভৃতির ভয় উপেক্ষা করিয়াও স্বকীয় কর্মপদ্ধতিতেই রত রহিয়াছে। বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহাদের কোন কোন বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকিলেও শ্রীমান মদনমোহন এবং তাহার অন্যান্য বর্তমান সহকর্মীগণের অধ্যবসায় ও সৎ-আকাঙ্ক্ষার অবশ্যই প্রশংসা করিতেছি।

গ্রন্থকার নিজে ভুক্তভোগী এবং পরদুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন ; তাই আন্দামানের বিভিন্ন জাতীয় বন্দীগণের নানাবিধ দুঃখ, যন্ত্রণা ও হতাশার ভাবগুলি প্রত্যক্ষদর্শন ও অনুভূতির প্রভাবে বিশদ ভাবেই বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। কি ভাবে হৃদয়হীন পাঠান জাতীয় ক্রুরকর্মা বন্দীগণ নিঃসহায় অপরাপর বন্দীগণকে, বিশেষতঃ হিন্দুদের বিভিন্নরূপ অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত করিতে উৎসাহ পাইয়া থাকে তাহার আভাসও এই পুস্তকে যথেষ্ট রহিয়াছে।

কোন কোন ঘটনার বর্ণনা মধ্যে সামান্য দুই-একটি ভ্রম-ভ্রান্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। তথাপি এই পুস্তকে কর্তৃপক্ষগণের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়াই শ্রীমান সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

দেশের কর্তৃপক্ষগণ এবং বর্তমান দেশকর্মী রাজবন্দীগণের, বিশেষতঃ যাঁহারা দেশের কল্যাণ, উন্নতি ও পরিবর্তনমূলক বিভিন্নরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের মধ্যে কোনও প্রীতির ভাব কিম্বা সদ্ভাব কিছুতেই

আশা করা যায় না। তাই দেশহিত ব্রতে রত হইতে হইলে কিরূপ ঘটনা-চক্রের মধ্য দিয়া কত রূপ অভাবনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের কবলে পতিত হইতে হয়, তাহা যদি দেশকর্ম্মীগণ, বিশেষতঃ বাংলার তরুণ সম্প্রদায় জানিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীমান মদনমোহন ভৌমিকের "আন্দামানে দশ বৎসর" গ্রন্থখানি অবশ্যই একবার পাঠ করিবেন।

বন্দী অবস্থায় থাকিয়াও দেশকর্ম্মীগণ কিরূপ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কিরূপ কৌশলে আংশিকভাবে কারা-শাসন-পদ্ধতির কতকগুলি সংশোধন সাধন করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই উদ্যমে কেহ কেহ কিরূপে প্রাণবিসর্জন পর্য্যন্ত দিয়াছেন—এই গ্রন্থ মধ্যে সে সম্বন্ধেও অনেক বিষয় পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। কতদূর ঐকান্তিকতা, মানসিক বল, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা, কতদূর সহ্যগুণ এবং কতদূর অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেশকর্ম্মীগণের কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়, এই গ্রন্থপাঠে সেই বিষয়ে দেশবাসীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া উপকার সাধন করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

১৩ বৈশাখ, ১৩৩৭
কলিকাতা

শ্রীপুলিন বিহারী দাস

কৈফিয়ৎ

একথা বলতেই হয় যে, যাঁদের হাতে ও যেভাবে দুইটি ডোমিনিয়ানে বিভক্ত ভারতবর্ষে শাসনাধিকার হস্তান্তরিত হয়েছে সেখানে স্বাধীনতা অর্জনে বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের স্থান নেই। ক্ষমতাধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ ও বশম্বদ প্রচার-মাধ্যমগুলো দেশে-বিদেশে অকুণ্ঠিত ভাষায় অনর্গল এ-কথাই বলে চলেছে যে, গান্ধীজীর অনন্য রক্তপাতহীন সংগ্রামেই দেশের স্বাধীনতা এসেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও শুরু হয়েছে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকেই, সেখানে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি, গোখলে, তিলক, লালা লাজপৎ রায়েরও যেমন কোনো ভূমিকা নেই, বিপ্লবীদেরও কোনো দাবি নেই। চারিদিকে অহিংসার স্তোকবাক্য এমন অনর্গল ঘোষিত হয়েছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে প্রথমে মহারাষ্ট্রে স্বল্পকালীন, পরে বাংলার যে দীর্ঘকালীন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়েছিল তাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্ণ ও দৃষ্টিগোচরে আসতে পারেনি।

সুতরাং, বেসরকারি ইতিহাস একটা থাকবেই, যেখানে অনাদৃত উপেক্ষিতদের স্থান হবে, থাকবে সমান্তরাল কাহিনী, যেখানে দেশপ্রেমিকেরা কান পেতে শুনবেন কি দুঃসহ ক্লেশের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা। মদনমোহন তাঁদেরই একজন। মদনমোহন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলা অন্তর্গত ডুমনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃহত্তম বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। সন্দেহ নেই, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন সারা বাংলা জুড়ে পরিচালিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। আট বছর বাদে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুলিস যখন প্রথম তাঁকে গ্রেপ্তার করে তখন তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ; কিন্তু প্রমাণাভাবে পুলিস মামলা তুলে নিলে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু এক বছর বাদে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়েন এবং বরিশাল দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেটের

আদালতে মামলার প্রাথমিক শুনানি হয় ; তারপর দায়রা বিচার ২৪ মার্চ। তিনি ছাড়া এই মামলায় ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশ চন্দ্র (দত্ত) চৌধুরি ও খগেন্দ্রনাথ চৌধুরি। দায়রা বিচারের রায়ে (২৯ নভেম্বর) মদনমোহনের ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ১৫ বছর দ্বীপান্তর, খগেন চৌধুরির ১০ বছর দ্বীপান্তর, রমেশ চৌধুরির এবং প্রতুল গাঙ্গুলিরও ১০ বছর করে ঐ একই দণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীলের ফলে রমেশ চৌধুরি ও প্রতুল গাঙ্গুলী মুক্তিলাভ করেন, মদন ভৌমিকের ১০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল থাকে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ১৫ বছর দণ্ড কমিয়ে ১০ বছরে চূড়ান্ত হয়। খগেন চৌধুরির ১০ থেকে ৭, কিন্তু ইতিপূর্বে বরানগর ডাকাতি মামলায় তিন বছর কারাদণ্ড হয়েছিল ; হাইকোর্টের নির্দেশ থাকে যে পূর্বের মেয়াদ শেষ হলে সাত বছরের দণ্ড আরম্ভ হবে, অর্থাৎ, মোট ১০ বছরেরই মেয়াদ দাঁড়ায়।

দ্বীপান্তর মানেই আন্দামানে কারাবাস। মদনমোহন মুক্তির পর এই দণ্ড-কালের যে স্মৃতিচারণা করেন তা-ই "আন্দামানে দশ বৎসর" শিরোনামায় প্রকাশিত হয় ; প্রকাশ করেন তৎকালীন "যুববাণী সাহিত্য চক্র", কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে। বইখানির ভূমিকা লেখেন পুলিন বিহারী দাস ; এমন একখানি বইয়ের ভূমিকা লেখার যোগ্যতর ব্যক্তি তাঁর মতো আর কোন ব্যক্তি হতে পারেন না, প্রয়োজনও করে না। পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতি পুলিন বিহারী দাসের সমার্থক হয়ে উঠেছিল এবং পূর্ববঙ্গ বলতে উত্তরবঙ্গও বোঝাতো, অর্থাৎ, বর্তমানে বাংলাদেশ নামে যে একটি পৃথক রাষ্ট্র হয়েছে পুলিন বিহারীর কর্মতৎপরতা সেই ভৌগোলিক সীমানায়ই বিস্তারিত হয়েছিল। যদি কখনও বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় তবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ এই বইখানি হবে তার এক অমূল্য উপকরণ। দুর্ভাগ্যবশত, লেখক মদনমোহন ভৌমিক নেই, ভূমিকা লেখক পুলিন বিহারী দাস নেই, প্রকাশকও নেই। তাই লেখক সমবায় সমিতিকে এই বইখানি পুনঃ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হোল।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

"কিন্তু সে
তার আধ-খাওয়া শরীরের ভিতর
আজও সযত্নে বহন করে
আগুনের পরশমণি,
তার বন্দী জীবনের
মনুষ্যত্ব"

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



মদনমোহন ভৌমিক

পূর্বাভাষ

বহু অতীত অন্ধকারের কথা, পাঁচটি জীব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, বাহ্যিক জগতের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন; শেষের দিন দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যৎ পরিণাম প্রতীক্ষায় বসিয়া পরস্পরে নানারূপ কল্পনার আকাশকুসুম রচনা করিতেছে, কখনও খেলায়—কখনও গল্পে—কখনও বা আমোদ কৌতুকে—কখনও বা লেখা-পড়ায় সময় কাটাইতেছে—ভবিষ্যতের কোন্ স্থানে যে এই বর্তমানের সন্ধিস্থল তাহার কোন সন্ধান পাইতেছে না। এ ভাবে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—ক্রমে পনর মাস অতীত হইল। এই পঞ্চদশ মাসের শেষভাগেই যে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় তাহারা বসিয়াছিল সে ভবিষ্যৎ দেখা দিল; প্রতীক্ষার পরিণাম হইল একজনের পনর আর অবশিষ্ট চারি জনের প্রত্যেকের দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ড। জেলের আইন অনুসারে, আইন না বলিয়া প্রথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না. প্রত্যেককেই বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইতে হইল—তিন পোয়া হাত লম্বা ডবল সূতায় বোনা জাঙ্গিয়া দুইটা, হস্তবিহীন পৌনে দুই হাত লম্বা জামা, আড়াই হাত লম্বা গামছা, একটা টুপী, ঘোড়ার গায়ের কম্বলে তৈরি একটা কম্বল-কোট ও দুইটা কম্বল হইল সম্বল, আর অলঙ্কার হইল মোটা লোহার তারের একটি গোলাকার চাকার মধ্যে ঝুলানো ত্রিকোণাকার কাষ্ঠ 'গলার হাসলী'—তাহাতে লেখা রহিল 8162. 10y. 29. 11. 15 উপরে—28. 11. 25 নিম্নে। একটা নম্বর, একটা দণ্ডের পরিমাণ. একটা দণ্ডের তারিখ এবং শেষটি মুক্তির তারিখ। ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং সোয়া ইঞ্চি ডায়েমেটারের লোহার ডাণ্ডা প্রত্যেক পায়ের কয়ড়ার সঙ্গে গাঁথা এক প্রান্ত এবং অপর প্রান্তের আংটার সঙ্গে তিন হাত লম্বা একটা চামড়া বাঁধা—সেই চামড়া দ্বারা বেড়ীটি কোমরের সঙ্গে ঝুলান—ইহা হইল পায়ের নূপুর।

এরা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ৫।৬ দিনের মধ্যেই স্থানান্তরিত হইল; সেই স্থানে যে স্থানে বঙ্গের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাসাধক আজ ২০ বৎসর যাবৎ নিপীড়িত, নির্যাতিত হইতেছে—যে স্থানে বিপ্লবপথের প্রথম যাত্রী কানাই,

লইতে হইবে। কাহার নিকট বিদায় লইব, কে আমাদিগকে বিদায় দিবে—সকলেই দূরে। মনে মনে সহকর্মী, সহযাত্রী, সমপাঠী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য প্রভৃতি দেশবাসীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম ; জ্ঞানে কি অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহার জন্য ভারতের মনুষ্য, পশু, পাখী, তরুলতা প্রভৃতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলাম। এ সময় আমাদের সাক্ষাৎ-ভাবে বিদায় লইবার একজন সহকর্মী ছিলেন ইঁনি Roda case-এ Arms act-এ দণ্ডিত হন। তাঁহার নাম হরিদাস দত্ত। মনের কথা তাঁহাকেই জানাইয়া বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঃ

"বিদায় লইয়া এবে যেতেছি চলিয়া ভাই।
কর্মক্ষেত্রে শিশু মোরা ক্ষম যত অপরাধ তাই॥

ভারতের ছবি আঁকি যতনে হৃদয়ে রাখি।
কারাগারে দ্বীপান্তরে পূজিব যেখানে যাই॥

ভারতের স্বাধীনতা-ব্রতে ভুলিব না দীক্ষা দিতে।
বনের বিহগ ডাকি যদি না মানুষ পাই॥

স্বাধীনতা-তৃষানল এবে জ্বলেছে কেবল।
নিভাইবে এ অনল হেন সাধ্য কারো নাই॥

*

বাধা দিতে হেন কাজে বিধি যদি আসেন নিজে।
নির্ভয়ে বলিব তাঁরে হেন বিধি নাহি চাই॥

এই গানটি গাহিতে গাহিতে বাহির হইলাম।

যাত্রা

আমরা কারাগারের পাঁচ পর্দার ভিতর আবদ্ধ ছিলাম। এক, দুই করিয়া ক্রমে তিন পরদা অতিক্রম করিলাম, তখন সুযোগ পাইয়া মন একবার চাহিল গার্ডেনরিচ মামলার রাধাচরণ প্রামাণিককে দেখিবার জন্য। এদিক ওদিক নিরীক্ষণ সতর্কভাবে অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। সে আজ ইহজগতে নাই, তাহার অমর আত্মা অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার উদার স্বভাব, করুণ প্রাণ, নির্ভীক হৃদয় কোন আনন্দের জন্য ইংরেজ শাসকের নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আদেশকে ফাঁকি দিয়া এবং কারাগারের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে আজ চির মুক্ত—চির স্বাধীন, সর্ববন্ধনহীন, কোন বন্ধনই তাহাকে বাধা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। আজও তাহার মহৎ প্রাণের কথা ভুলিতে পারি নাই, তাই তাহার একটু স্মৃতিচিহ্ন এখানে রাখিয়া গেলাম।

ক্রমে আমরা main gate-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিবার পূর্বেই দায়মলী খাতার অন্যান্য ৭৬ জন নির্বাসিতকে আনিয়া জোড়া জোড়া এক এক স্থানে এক এক group বসাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেকের পায়েই বেড়ী, সেই বেড়ী বাঁধিবার জন্য চামড়ার ফিতা বিতরণ হইতেছে। কেহ বলিতেছে আমাকে, কেহ বলিতেছে মেন্নু, মুঝে, মলা ইত্যাদি কে কার অগ্রে গ্রহণ করিবে এ নিয়া যেন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দূর হইতে মনে হয় লুট বিতরণ করা হইতেছে আর সকলেই যেন নারায়ণের লুটের প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত। নিকটে আসা মাত্রই আমাদিগকে শচীনের সঙ্গে বসাইয়া দিল। ভিতর হইতে জেলার হিল সাহেব বাহিরে আসিয়া আমাদের উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেল। আমাদের উপর সরকারের দৃষ্টি চিরকালই তীক্ষ্ণ সে জন্যই হিল সাহেব ভিতরে যাইয়া আমাদের in charge আন্দামানের Chief Engineer সাহেবকে দেখাইয়া দিল। এই মুহূর্ত হইতেই আন্দামানের দৃষ্টিতে পড়িলাম। জেলের নিয়মানুসারে নির্বাসিতের সমস্ত private property বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়। তদনুসারে আমাদের সমস্তই বিক্রয় হইয়াছে। Assistant Jailor

আসিয়া private property বিক্রির কার কত টাকা warrant-এ জমা হইয়াছে তাহা শুনাইয়া দিল।

এবার জেলার আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া উঠাইল তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম—রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। পাঁচ পর্দার বাহির হইলাম। এ সকল গণ্ডীর পরদা ক্ষুদ্র সুতরাং অতিক্রম করিতেও গৌণ হইল না, কিন্তু এবার আসিয়া এক বৃহদায়তন পরদার ভিতর পড়িলাম—ইংরাজ শাসন-তন্ত্রের বেড়াজাল। আমাদের দেশের লোকের ধারণা যাহারা কারাগারের নিগড়ে আবদ্ধ তাহারাই বদ্ধ, তাহারাই বন্দী; একথা স্বাধীন দেশ জাপান, আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ, জার্মানি, ফরাসি, ইটালির পক্ষে শোভা পায় কিন্তু পরাধীন পরপদদলিত ভারতবাসীর পক্ষে নহে। আমরা পাঁচ পর্দার বাহিরে আসিয়াও মুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। আমাদের রুদ্ধদ্বার খুলিয়াও খুলিল না। বাহিরে আসিয়া আমরা পাশাপাশিভাবে এক সারিতে চারিজন বসিয়া গেলাম, অবশিষ্ট ৭৬ জন নির্বাসিতও আমাদের অনুসরণ করিল। Front rank-ই আমাদের। এবার জেলার হিল সাহেব তাহার শেষ ঝাল মিটাইয়া লইবার জন্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া প্রথমেই শচীনকে দেখাইয়া বলিল, "you won't come back" শচীন বলিল, "why ?" "you will be killed by the adorigines" হিল সাহেব এই উত্তর দিল। হিল সাহেব এরূপ উত্তর কেন দিল তাহার একটা কারণ আছে; এখানে সংক্ষেপে একটু বলিয়া রাখি; স্থানান্তরে বিশেষ ভাবে বলিব। শচীন যখন বেনারস জেলে আবদ্ধ তখন সে একবার পলায়নের চেষ্টা করে এবং তাহার বন্দোবস্ত যখন ঠিক হয়, জিনিষপত্র যখন আসিয়া যায়, যে দিবস সে পলায়ন করিবে সে দিবসই একজন কয়েদী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি বলিয়া তাহার অস্ত্র ও সমস্ত সরঞ্জাম ধরাইয়া দেয়। হিল সাহেব যে সে কথাটা জানিতে পারিয়াছে তাহার ঐরূপ উত্তরেই আমরা বুঝিতে পারিলাম। আমাকে দেখাইয়া বলিল, "You will remain there" আমি বলিলাম, "How do you know ?" তখন হিল বলিল, "Malaria consume you there" একথা বলার মধ্যে একটা সত্য ধারণা তাহার হইতে পারে, কারণ আমি যখন ধরা পড়িয়া Presidency জেলে আসি তখন কালাজ্বর আমার skeleton দেহেই বহন করিয়া আনিয়াছিলাম। খগেনবাবুকে দেখাইয়া বলিল, "There is hope for you" ত্রৈলোক্যবাবুকে দেখাইয়া বলিল, "you will

die there" তাহাকে একেবারে জবাব দিয়া দিল। কারণ তিনি ধৃত হওয়ার পূর্ব হইতে হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন ত্রৈলোক্যবাবু তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মালভেনির নিকট যে complain করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে হিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হিল সাহেব বলিল, "We have got special order from the Govt. not to detain you here," পরে দেখা গেল টিকেটে লেখা আছে Hasasthma, Fit for travel vide I G P. letter No—এ সকল আলাপের পর হিল সাহেব তাঁহাকে একটু আশাও দিল যে "Don't be hopeless ; you will get sea climate there which is much beneficial to cure asthma. You will get that treatment there which is impossble in Indian Jail." পূর্বে ছিলাম Hutchinson, Tegart, Colson ও গুর্খা পুলিশের হাতে, পরে জেল Surgeant-এর হাতে, এবার পড়িলাম আন্দামান মিলিটারি পুলিশের হাতে। Andaman Police Inspector আসিয়া আমাদের দাঁড়াইবার আদেশ করিল। সর্বাগ্রে আমরা দাঁড়াইলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিল এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে Forward হইল। আশি জনের পায়ের বেড়ী ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, এই বেড়ীর তালে তালে সৈনিক শ্রেণীর ন্যায় চলিলাম। এতগুলি লোকের দুরবস্থা দেখিয়া প্রকৃতি দেবীও যেন তাঁহার দুঃখ সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। দুঃখের বাহ্যিক প্রকাশের জন্য বরুণদেব আবির্ভূত হইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমাদের তখন আশ্রয় পাওয়ার কোন স্থান ছিল না কারণ আমরা আজ ঘরের নই পরের! প্রত্যেকের হাতেই লোহার থালা বাটী এবং উহার সাহায্যেই আপন আপন মাথা বাঁচাইলাম। অর্ধ রাস্তায় যাওয়ার পর বৃষ্টি থামিয়া গেল, রক্তরাগ অরুণ দেবের হাসিমুখ আবার দেখা দিল।

আমাদের এই সেনা দলে হিন্দুস্থানি, বিহারী, পাঠান, বোম্বাই, আসামী, উড়িয়া, বেলোচ, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। পাঠানরা গান ধরিয়া দিল; শিখরা গ্রন্থ সাহেবের শ্লোক উচ্চারণ এবং হিন্দুস্থানীরা "জয়কালী মাঈকি জয়" মুসলমানরা "আল্লা আল্লা" ধ্বনি করিতে লাগিল। আর কেহ বা তালে তালে বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে চলিল। আর ভেতো বাঙ্গালীগুলি লক্ষ্মীছাড়া মুখ করিয়া মরার মত চলিল। পাঠানদের গান বুঝি আর না বুঝি কিন্তু শ্রুতি-

আ[illegible] হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল হৈ-চৈয়ের মধ্য দিয়া আমরা যেন রণসাজে ঢাল-তলোয়ার বিহীন নিধিরাম সিপাই সমর যাত্রা করিতেছি। আবার আমাদের মার্চও তেমনি "ঘাস্ বিচালি ঘাসের" মত। আমাদের চারিধারে টোটা ভরা সঙ্গিন অবস্থায় আন্দামান পুলিশ পাহারা। আমাদের সম্মুখে নিকটেই সেই Inspectorটি ছিল—আমরা তাহার সঙ্গে আন্দামানের সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছি আর যতদূর দৃষ্টি পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত নয়ন ভরিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাঙলা দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি।

"নন্দন-কাননে কিবা শোভাহার,
বনরাজি কান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান"

আজ সেই স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছি—কোথায় নির্বাসিত হইতেছি! এ সময় মনে হইল যদি একটি বিশ্বাসী লোক পাই তবে মনের ব্যথার কথা, শেষ গোপন কথা একবার তাহাকে বলিয়া যাই। সে লোকও পাইলাম না বলিতেও পারিলাম না, সে কথা আজ এখানেও লিখিব না।

ক্রমে আমরা গঙ্গার তীরস্থ কয়লাঘাটের নিকটবর্তী হইলাম, অল্প দূর হইতে একখানা ছোট জাহাজও দেখিলাম; এবার ঘাটের উপর আসার পরই আমাদের বসিবার হুকুম হইল, বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে পাইলাম জাহাজখানার গায়ে অগ্রভাগে লেখা আছে Maharaja। তখন আমাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যবাবুকে নিয়া একটু ঠাট্টাচাতুরীও চলিল। ত্রৈলোক্যবাবু আমাদের সকলেরই নিকট বুদ্ধিমান স্থির, ধীর ও সাহসী চরিত্রবান বলিয়া মহারাজ নামে পরিচিত; তাঁহাকে অনেকেই তাঁহার স্বনামে চিনেন না। আজ মহারাজাকে যাত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া বাহক হইবার জন্য the maharaja উপস্থিত—ইহাই ছিল ঠাট্টার কারণ। ইতিমধ্যে আমাদের Regiment-এর গণাবাছা হইয়া গেল, উপর হইতে সিঁড়ী নামিয়া আসিল; মনে হইল এবারই দেশের মাটি হইতে পা উঠিবে। কতই না উৎফুল্লচিত্তে গাহিতাম ঃ

এ দেহ তোমার মাটি হতে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে

মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা হবে অবসান।

আজ আর সে আশা রহিল না—দেশের ধূলিকণাকে বোধহয় স্বর্ণরেণু বলিয়া মনে করিতে, দেশের মাটি বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে, দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিতে পারি নাই তাই আজ মাটির উপর আমাদের পা রাখিবার অধিকারও রহিল না। এই চিন্তা করিতে করিতে দেশের, ভারতের একখণ্ড মাটি সঙ্গে লইলাম, লইলাম শুধু এই জন্য যদি জীবন ওখানেই শেষ হয়, যদি আর দেশে ফিরিয়া আসিতে না পারি, যদি মায়ের ফলশস্যে, জলবায়ুতে পরিপোষিত ও পরিবর্ধিত হইয়া মৃত্যুকালে তাহার পরশ হইতে বঞ্চিত হই তবে এই মাটি বক্ষোপরি ধারণ করিয়া ভারতের (মাটির) ধ্যান করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব।

উঠিবার হুকুম হইল—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে,
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

এই বন্দনা উচ্চারণ করিতে করিতে দেশের মাটি হইতে শেষ পা উঠাইলাম।

জাহাজে পাঁচ দিন

১৯১৬ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখ সিঁড়ীর পর সিঁড়ী অতিক্রম করিয়া চন্দ্রনাথের চূড়ায় উঠার ন্যায় একেবারে জাহাজের সর্বোচ্চস্থানে উঠিয়াছি। এ-স্থান হইতে চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। যতই দেখি ততই দেখার প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলিল আর প্রতিনিয়ত এই ধারণা হইতেছিল এই বুঝি যবনিকা পাত হয়। এই বুঝি অস্ত-গমনোম্মুখ সূর্যের ন্যায় ডুবিয়া যাই, এই বুঝি অন্ধকূপে নিমজ্জিত হই! স্বর্গাদপি গরীয়সী সকল দেশের রাণী ভারতবর্ষ বুঝি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইয়া যায়! যাহার রূপ ভুবন মনোমোহিনী, চন্দ্রে যার হাসি, সূর্যে যাঁর দীপ্তি, নিকুঞ্জকানন যাঁর সৌষ্ঠব, যাঁহার শস্য শ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র মনোমুগ্ধকর, যাঁহার নদনদী পীযূষ ধারা বহনশীল,—সে বহু রত্ন প্রসবিনী মাকে বুঝি আজ আমরা হারাই! ফলে তাহাই হইল! দেশের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন আজ আমরা মাতৃহীন সন্তান।

আমরা উপরে উঠিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে এ-স্থান আমাদের জন্য নহে কারণ আমাদের অবস্থার সঙ্গে এ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হয় না। কয়েদীর বালাখানা শোভা পায় না। এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিলাম, এ-স্থান লম্বা লম্বা বেতনভোগী শ্বেতাঙ্গের জন্য। আমরা এ স্বর্গ ছাড়িয়া মর্তে গেলাম, দেখিয়া মনে হইল সম্ভবতঃ এ-স্থান আমাদের জন্য; এ-স্থানে থাকার পর আরও নীচে যাওয়ার হুকুম হইল সে স্থানে পৌঁছিয়া মনে করিলাম এবার যখন পাতালে প্রবেশ করিয়াছি ইহার পর আর কোথায় যাইব, নিশ্চয়ই এই শেষ। কিন্তু আমরা বন্দী, দণ্ডিত ও নির্বাসিত আমাদের স্থান ত্রিজগতের কোথাও হইল না। আরও নীচে যাওয়ার হুকুম হইল—গেলাম। যাওয়ার পর বিশ্বাস হইল এবার যখন ত্রিজগতের বাহিরে আসিয়াছি তখন আর কোথাও যাইতে হইবে না এবং আমাদের এ বিশ্বাসও সত্যে পরিণত হইল। দ্বিতীয়বার যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম উহা অত্যন্ত কদর্য, বায়ু চলাচলহীন অন্ধকারাবৃত; অব্যবহার্য ক্ষুদ্রায়তন মেঝেয় বিক্ষিপ্তাবস্থায় কতকগুলি

কম্বল রক্ষিত ; এ কারণেই উহা আমাদের যোগ্য বলিয়া মনে হইল। পরে উহা আমাদের প্রহরী শিখ ও মুসলমানদের জন্য জানিয়া আশ্চর্য হইলাম। তাহারা যে কোন দেশী বা প্রদেশীই হউক কিন্তু আমাদের দেশের লোক—আমাদের সহোদরকল্প। এই পৃথক ব্যবস্থা, এরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগিল, হৃদয়ে অনল জ্বলিয়া উঠিল, এ অনল কখন কোন্ শুভক্ষণে যে নিভিবে, কোন অমৃতযোগে যে শান্ত হইবে কে জানে ; সে এক সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

আইন-কানুনের কর্তা তারা
তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ-সুবিধা তাদের ভারতময়।

*

তাদের কলে তোরাই কুলী
তারাই নিচ্ছে টাকার ঝুলি
ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।

কবির এ উক্তি আজ মর্মে মর্মে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম। এই গেল ত্রিতলের কথা। কেহ দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদের ন্যায় বুঝিয়া ভুল করিবেন না। আমরা জাহাজের খোলে প্রবেশ করিতেছি, এ-স্থানে নিম্ন হইতে উপরে যাওয়ার উপায় নাই। সর্বাগ্রে উপর হইতেই নিম্নে আসিতে হয়। অতঃপর তৃতীয়বার আমরা দ্বিতলে প্রবেশ করিলাম। সে স্থানের অবস্থা দর্শনে সকলেরই নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইল—নাসিকা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ইহা মানুষের ব্যবহারের যোগ্য এ ধারণা কিছুতেই হইল না। এমন দুর্গন্ধময় কদর্য ও অব্যবহার্য স্থানের তুলনা করিতে হইলে আমাদের সহরের ধারে municipality-র পুরীষ মূত্র ত্যাগের সদর স্থানগুলিই উপমার যোগ্য। বহু বৎসর পূর্বে ১৯১৪-১৯১৯ সালের জার্মান যুদ্ধের সময়ে London Times-এ আইরিশ বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে যে স্থানে রাখা হইয়াছিল সে স্থানের কদর্যতা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছিল এ-স্থানেরও তুলনা কতকটা উহার সঙ্গে হইতে পারে। এ যেন তৈলের গুদাম ঘর। আমরা স্বর্গ-মর্ত্য অতিক্রম করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছি ত্রিজগতের মধ্যেই যখন সৃষ্টির বিকাশ—জীবের বাস তখন আমাদের এ-স্থানেই প্রবাসী হইতে হইবে এ বিশ্বাসই হইল। পরে

দেখিলাম এ-স্থানও আমাদের জন্য নহে এবার আমাদের সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইল—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের কোন স্থানেই আমাদের স্থান হইল না—আরও নীচে গেলাম এবার আসিয়া অন্ধকূপে প্রবেশ করিলাম। বাঙ্গলা দেশের অনেকেই হয়ত আলিপুর চিড়িয়াখানার সিংহ ও শার্দুল পোষার স্থানটি দেখিয়াছেন ; উহা যেরূপ লোহার শিক দ্বারা চতুর্দিক সুরক্ষিত আমাদের এ অন্ধকূপের সঙ্গেও উহার সাদৃশ্য আছে। ৪টি প্রকোষ্ঠ পুরুষের জন্য আর একটি স্ত্রীলোকদের জন্য। আমাদের ৮০ জনকে চারি কক্ষে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিল। এ-স্থানে বায়ু চলাচল বন্ধ, আলোক-রশ্মির উপর ১৪৪ ধারা জারি, তবে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের এক পাশে জাহাজের গায়ে দুইটি করিয়া ফুটবলের সমপরিমাণ কাঁচাবৃত গোলাকার স্থান আছে, (post hole) আলোক-রশ্মি সময় সময় civil disobedience করিয়া উহার মধ্য দিয়া আমাদের কক্ষে উঁকি দেয়। আন্দামানের সরকারী কাজের জন্য যথা হাতী-গরু-ঘোড়া-ভেড়া এ দেশ হইতে নেওয়া হয়, তখন তাহাদের স্থান যেখানে হয়, মাল-মসলা ধান-চাল-ডাল যেখানে রক্ষিত হয়, আমাদের স্থানও সেখানেই—যে স্থানে মশা-মক্ষিকা ভয়ে প্রবেশ করে না সে স্থানেই প্রবাসী হইলাম আমরা। আবার ইহারই মধ্যে এতগুলি লোকের মল-মূত্র ত্যাগ করার স্থান একটা পিপার অর্ধাংশে। প্রয়োজন হইলে সকলকে সাক্ষ্য করিয়াই অসভ্যের ন্যায় নির্লজ্জের ন্যায় কাজ শেষ করিতে বাধ্য, কারণ "হাগায় না মানে বাঘার ভয়।"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল কি না বুঝিতে পারিলাম না—যে স্থানে অন্ধকারের রাজত্ব, যে স্থানে আলোর প্রভাব খর্ব, যেখানে দিবারাত্র এক, সেখানে সন্ধ্যা বা ঊষার পরিচয় পাওয়া যায় না—উপলব্ধি হয় না। ইহারই মধ্যে আপন আপন সম্বল কম্বলগুলি স্তূপ হইতে কায়ক্লেশে অনুমানে বাছিয়া লইয়া আমরা চারি কক্ষের এক এক কোণে শয্যা করিয়া লইলাম। অল্পক্ষণ পরে সন্ধ্যাবার্তা নিয়া বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিল—প্রকৃতি দেবী সন্ধ্যার আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। আজ আমাদের রাত্রি ভোজের কোন ব্যবস্থা হইল না—অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল ; বিজলী বাতি দিবা আগত সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেল ; ভোরে নঙ্গর উঠাইয়া জাহাজখানা মন্থরগতিতে ধীরে ধীরে ডায়মণ্ড হারবার অভিমুখে যাত্রা করিল। আমরা হাত-মুখ ধুইয়া সেই কাঁচাবৃত গোলকমধ্য দিয়া বার বার

রাজরাণী বীরপ্রসবিনী রত্নগর্ভা প্রতাপ-শিবাজী-জননী সুখদা বরদা ভারত মাতাকে মনের সাধে দেখিতে চেষ্টা করিলাম ; সে চেষ্টা একবার দু'বার নয়, শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রায় সমস্ত দিন একজন আর একজনের সাহায্যে প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইতে যত্ন করিলাম। একজন কোমরে ধরিয়া উঁচু করিয়া রাখিলে দেখিবার সুবিধা হইত। নচেৎ বেড়ী-পায়ে লম্ফ প্রদানে কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব ছিল। বেলা দশটার সময় আমাদের খাবার আসিল চিড়া, চিনি, তেঁতুল, নুন, ছোলাভাজা আর চাটগাঁয়ের লম্বা লম্বা শুকনা লঙ্কা। পূর্ববঙ্গের নৌকার মাঝির মত চিড়া চিনি জল সংযোগে উদরসাৎ করিয়া উদরানল নিবৃত্তি করিলাম। চারিটার সময় আবার খাবার উপস্থিত। চারিটার সময় খাবার উপস্থিত শুনিয়া কেউ মিঠাই সন্দেশ মনে করিবেন না—ইহা কয়েদীর খানা সেই চানা আর চিড়া। প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বিজলী বাতি তাহার সংবাদ পৌঁছাইল—সন্ধ্যা হইল বুঝিতে পারিলাম। আমরা রাত্রির আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। রজনীর শেষ ভাগে, জাহাজ সমুদ্রের ফেনিল উত্তাল তরঙ্গের মাঝে উপস্থিত বুঝিতে পারিলাম। ভাদ্র মাস দিবাভাগে আকাশ মেঘের মায়াজালে আবৃত, সূর্যের কিরণ রেখা ম্লান সাগর বক্ষে পড়িয়াছে। গুড়ু গুড়ু রবে, সাগর তরঙ্গের নৃত্যে নিনাদিত। বুক ফাটা অসীম তরঙ্গের হিল্লোলে অন্তহীন আশা লইয়া অল্পায়তন দোদুল্যমান জাহাজখানা সমুদ্রের বক্ষভেদ করিয়া গমন করিতেছে, এ অবস্থায় post bole দুটিও বন্ধ করিয়া আমাদিগকে জগতের বাহির করিয়া রাখিল।

সকলকে sea sickness-এ ধরিয়াছে, কাহারো মাথা উঠাইবার ক্ষমতা নাই, ক্রমে সকলেরই স্ফূর্তি নষ্ট হইয়া আসিল। সমুদ্রের মাতলামীতে সকলকেই পাইয়াছে, "সংসর্গরা দোষা গুণা ভবন্তি"র প্রভাব সকলেরই উপর পড়িয়াছে, আমরা শির ঘূর্ণনে ও বমনের যন্ত্রণায় অস্থির। কোথায় আছি, কোথায় যাইতেছি, জগতে প্রকৃতির অবস্থা কি সকলই অপরিজ্ঞাত। প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে চিড়া চানা আনার ত্রুটি নাই কিন্তু খায় কে ? খাবার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তির অভাবে আয়োজন করিয়া নেওয়া কঠিন। সুস্থ-অসুস্থ, সবল-দুর্বল যেখানে একত্র, সেখানে সুস্থ ও সবল, অসুস্থ ও দুর্বলকে সাহায্য করিতে পারে। এখানে সকলেই অসুস্থ, সকলেই দুর্বল, সকলেই সাহায্য-প্রার্থী সকলেরই অবস্থা এক, কে কাহার সেবা করে, কে কাহাকে ভোজন করায়! কে কাহার আপন, কে কাহার পর সকলেরই অবস্থা "চাচা

আপন পরান বাঁচা।" চারিটা বাজিয়া গেল, আমাদের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিল। মুক্ত হাওয়ায় ছাদের উপরে সকলেরই যাওয়ার আদেশ হইল। হাফ ছাড়িয়া বাঁচিবার আশায় শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও বেড়ী নিয়া সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়া এ দুর্বল শরীরটাকে কোন প্রকারে টানিয়া উঠাইলাম। এখানে সুখের লোভে আসিয়া দেখি বাতাস মাতাল, একা-বেকা ফনা তোলা তরঙ্গে সমুদ্র ক্ষ্যাপা, চতুর্দিকে অনাতি দূরে আকাশ ও সমুদ্রের যেন মিলন হইয়াছে মনে হয়। সমুদ্র, আকাশ ও ক্ষুদ্র জলযানখানা ব্যতীত যেন জগতে আর কিছুই নাই, এ তিনটি জিনিষ লইয়াই যেন জগৎ। আমরা সেই জগতের অধিবাসী প্রত্যেকটি উন্মাদ তরঙ্গ আকাশকে স্পর্শ করার জন্য ব্যস্ত, তরঙ্গ সমষ্টি সাগরকে সঙ্গে লইয়া আকাশের সঙ্গে মহামিলনের জন্য প্রয়াসী। উর্মিমালার গর্জনে আকাশ যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে! এই মত্ত ঢেউয়ের উপর দৃষ্টি পড়িলে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত নির্গত হইতে চায়; তখন মুক্ত বায়ু সেবনের প্রবৃত্তি আর কারো থাকে না। তখন নীচে থাকিলেই যেন বাঁচি।

সমুদ্র ক্ষ্যাপা হইলেও উহা দেখিবার প্রবৃত্তি আমাদের খুব জন্মাইয়াছিল। দুর্ভোগ ভুগিতে হইলেও এ লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। কোন ফাঁকে একবার অল্প সময় সমুদ্র দৃশ্য দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতাম। আমরা চারি জন ব্যতীত সহযাত্রীদের মধ্যে অন্য কাহারও একবারের বেশী দুইবার সমুদ্র দেখার প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এ সম্বন্ধে লোভের মাত্রাটা বোধহয় আমাদেরই বেশী ছিল; sea sickness-এর প্রতিষেধক Lime juice অল্প পরিমাণ পান করিয়া নীচে আসার হুকুম তামিল করিলাম। সেই রাত্রে আর আহার হইল না, আহারের কথা মনে হইলেই উল্টি (বমী) নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়। ভোর হইল, ৮টার সময় আবার উপরে যাওয়ার তাগিদ আসিল, যাওয়ার পর দেখিতে পাইলাম দুস্তর সমুদ্রের মাতলামীর নেশা পূর্বাপেক্ষা আরও বাড়িয়া গিয়াছে, ভাবিলাম এ চির অশান্ত, চির চঞ্চল, চির দুর্দান্ত, চির উন্মাদ—ইহার শ্রান্তি নাই—অবসাদ নাই—আলস্য নাই—আপনভোলা অদম্য উৎসাহী—অবিশ্রান্ত কর্মী। জাহাজখানা ইহার অনন্ত বিস্তৃত উর্মিমালার বুক চিরিয়া, অন্তহীন আশা ও অসীম সাহসে নির্ভর এবং চির চঞ্চল সমুদ্রের কলরোলকে ব্যঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে যাত্রার পথ শেষ করিতেছে। মাইল ব্যাপী

দুই তরঙ্গের মাঝে যখন জাহাজখানা ডুবিয়া পড়ে, তখন এত নীচে আসে যে উহার ৮।১০ হাত উপর দিয়া তরঙ্গগুলি চলিয়া যায় ; জাহাজখানা যেন জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। দুই মাইল দূরেই যেন উহাদের চির-বাঞ্ছিত জন্ম-জন্মান্তরের মহামিলন হইয়াছে। এবার শত ইচ্ছা থাকিলে কুজ্ঝটিকাময় িক্ষপ্ত সাগরের প্রতি কারো দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা হইল না—দৃষ্টিপাত করা মাত্রই উল্টি ; সাধ করিয়া গলায় ছুরি দেওয়ার প্রবৃত্তি কাহারো কখনও হয় না, সুতরাং আমরাও প্রলোভন সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম। এখন অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেই বাঁচি—নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মানুসারে লেবুর সরবৎ পান করিয়া নীচে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। আজ কোথাও যাইয়া শান্তি নাই—কাহারো দাঁড়াইবার কি বসিবার ক্ষমতা নাই, সকলেরই অবস্থা "ত্রাহি মাং মধুসূদন।" মরার মত শয্যাশায়ী হইলাম। বিছানা-পত্র সহ ওলট-পালট হইয়া এক সঙ্গে বারমসলা পেষার মত অবস্থা হইল আমাদের! বমীর বিরাম নাই—দুর্গন্ধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল, কারো এমন ক্ষমতা ছিল না যে একটু দূরে যাইয়া বমী নিঃসরণ করে। কেউবা আপন বিছানায় কেউবা অন্যের বিছানায় আবার কেউবা সামলাইতে না পারিয়া অন্যের দেহোপরিই উল্টি করিয়া দিতেছে। এ সকল অবস্থা দেখিয়া অপরাপর সাধারণ নির্বাসিতদের কারো কারো কলেরা হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইল এবং সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। বহু লোক প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। যারা আমাদের পাশে শায়িত তারা কাঁদ কাঁদ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত "বাবুজি! ক্যা হোগা, জাজ ডুব যায়গী? বাঁচনেকা কৈ ওমেদ হ্যা?" আমরা যথাসাধ্য তাহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিতাম, উহা তাহাদের বিশ্বাস হইয়াও যেন হইত না—যখন শিরঃযন্ত্রণায় এবং বমীর যন্ত্রণায় অস্থির হইত তখনই আবার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইত আবার অবিশ্বাস আসিয়া গ্রাস করিত। বিছানা-পত্র বমী ও জলে ভিজিয়া গেল, শোওয়ার স্থান পর্যন্ত নাই ; শুধু ডেকের উপর আধমরার অবস্থায় প্রায় সকলেই পড়িয়া রহিল। মহামারীর প্রপীড়নে পরিচর্যা ও সৎকারের অভাবে গ্রাম্য শ্মশানের যে অবস্থা হয় আমাদের এ অবস্থার সঙ্গে সে অবস্থার তুলনা হইতে পারে। এমন একটা দৃশ্য দেখিলাম—শবদেহগুলি শ্মশানক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, শ্মশান বন্ধুর অভাবে দাহ হইতেছে না—একটা বিভীষিকার জাগ্রত ভাব বিকাশ করিয়া তুলিয়াছে! পূর্বে অনেক স্থানে এই জীবন-মৃতের আশ্রয়স্থলের বর্ণনা

দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এখন ঐ সকল অবস্থা স্মরণ করিয়া এ নরক-কুণ্ডের অবস্থা বুঝিয়া লইতে পাঠকগণ চেষ্টা করিবেন, কল্পনাদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সচেষ্ট হইবেন। ভাষায় ব্যক্ত করিয়া অবস্থা বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই—আমার পক্ষে উহা অসম্ভব।

চারিটা বাজিয়া গেল। সমস্ত দিন আহার নাই, আরাম নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই এমন সময় আবার উপরে যাওয়ার ডাক পড়িল। সকলেই strike সকলেই refuse ; শুইয়াই প্রাণ বাঁচে না, যন্ত্রণা সহ্য হয় না, দাঁড়াইব কোন সাহসে! অন্যান্যকে ধমক দিয়া, ভয় দেখাইয়া, উঠাইয়া, লইয়া চলিল কিন্তু আমরা চারিজন absolutely refuse করিয়া একেবারে বাঁকিয়া বসিলাম। তখন Inspector আসিয়া বলিল Babu please come out. You will get relief on the top, otherwise you will suffer much dne to sea-sickness. For your benifit I request you to go again। তাহার কথায় বিশ্বাসে এবং কতকটা ভদ্রতার খাতিরে নির্ভর করিয়া উঠিলাম। উপরে যাইয়া দেখি চতুর্দিক অন্ধকার, কুজ্ঝটিকা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিপথে পড়ে না। এই অন্ধকারের মধ্যে অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া জলযানখানা শিশুর খেলার পানসি নৌকার ন্যায় ওলট-পালট অবস্থায় টলমল করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতেছে—উর্মিমালার মধ্যদিয়া Submarine-এর ন্যায় গমন করিতেছে। যাহারা জাহাজে-ষ্টিমারে বা নৌকায় কখনও চলাচল করে নাই, তাহাদের হঠাৎ এ অবস্থায় পড়িলে চিন্তাকুল ভীত বা সন্ত্রস্ত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। বাঁচার আশা নাই এবং মৃত্যু অনিবার্য ইহাই তাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

উপরে যাইয়া ঝাড়া-ফিরার (মলমূত্র ত্যাগ) ইচ্ছা আমাদের হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্হানটির অবস্হা জানিতে পারিব এ প্রবৃত্তিও জন্মিল। বেড়ী-পায় দুর্বল অবস্হায় আঁকা-বাঁকা অপ্রশস্ত সিঁড়ী দিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করার কালেই বুঝিতে পারিলাম ইহা কয়েদীর জন্য স্বতন্ত্র একটি স্হান। তাহাদেরই ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তৈরি হইয়াছে। ইহা পায়রা-পোষার পিঞ্জরার ন্যায় ১২০ ডিঃর মুখোমুখি দুই বাহুর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে সজ্জিত। অতি কষ্টে বসা যায়, বসিয়াও শান্তি নাই। নিম্নদেশ হইতে জলবিন্দু তাড়া করে, উধ্বর্দেশ হইতে টুপটাপ বারিবিন্দু নিপতিত হয়—দিবাভাগেই অন্ধকার। অতি কদর্য—পূতিগন্ধময়—বমনের বেগ না

থাকিলেও স্থান দেখিয়াই উল্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ স্থান সভ্য জগতের কোন ধার ধারে না, ঘৃণা-লজ্জা থাকিলে এখানে কার্য শেষ করা চলে না। কোন প্রকারে ঘৃণা-লজ্জা ত্যাগ করিয়া কার্যশেষে উপরে আসিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর উল্টির প্রতিষেধকটি পান করিয়া মৃতের মত নীচে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আজ চতুর্থ দিবস শেষ হইতে চলিল, সন্ধ্যাতারার ন্যায় বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে অনিদ্রায় কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। ভোর হইল এবার জাহাজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটবর্তী হইয়া তীরের সন্ধান পাইল। আজ আকাশের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক নির্মল—সাগরও সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়াছে। সাগর-দৃশ্য দেখিবার এই উপযুক্ত সময়, কিন্তু এ সুযোগে আর আমাদিগকে উপরে নেওয়া হইল না। প্রতি কক্ষের পাশের port hole দুটি হইতে অনুগ্রহ করিয়া ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়া লইল—ইহার মধ্যদিয়াই আন্দামান দ্বীপশ্রেণীর দৃশ্য দর্শন করিলাম। পূর্বে ধারণা ছিল ইহা অরণ্যাবৃত কিন্তু এখন দেখিলাম সমস্তই পাহাড়—এই পর্বত শ্রেণী উঁচু-নীচু হইয়া প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের শোভা বর্ধন করিতেছে, দেখিতে অতি সুন্দর অতি মনোহর। সাগর সলিলে পরিবেষ্টিত বলিয়াই ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলযানখানা দীর্ঘ সন্তরণ শেষ করিয়া যখন Port blair ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দেখিলাম সহস্র সহস্র নারিকেল বৃক্ষ শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক শ্রেণীর ন্যায় সমুদ্র বেলাভূমে দাঁড়াইয়া যেন জাহাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। ফলভারে নতশির সংখ্যাতীত নারিকেল বৃক্ষ কখনও বাংলাদেশের কেহ দেখিয়াছে কি না বলিতে পারি না, তবে ইহা আমাদের পক্ষে অভিনব। আবার যে নারিকেল বৃক্ষগুলি একেবারে সমুদ্রতটে সেগুলি বক্র হইয়া সাগর বক্ষকে যেন চুম্বন করিতেছে, ক্রমে মন্থরগতিতে জাহাজখানা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার জাহাজখানা তাহার যাত্রার প্রায় ৯০০ মাইল পথ শেষ করিয়া গতি বন্ধ করিল।

এ কয়দিন নানাবিধ যাতনা ও অসহ্য সোয়াস্তির মধ্যেই কাটাইয়াছি। কিন্তু যেই জাহাজখানা গতিহীন হইল, সেই তার আন্দামানে আগমন সন্দেশ বিদিত হইলাম, জাহাজখানা যখন একেবারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল তখন সহযাত্রিগণ পৌঁছ সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাতরভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল বাবুসাহেব! কালা পানিমে জাহাজ

আগিয়া ? হিয়াপর হি হামলোক কো উৎরানে হোগা ?" আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, "হাঁ হিয়াপরহি উৎরানে হোগা" যখন অন্ধকূপে পড়িয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম তখন এই ৮৬ জনের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিল যে যতশীঘ্র যাইয়া আন্দামানে পৌঁছি ততই মঙ্গল। কিন্তু যেই আসিয়া পৌঁছিলাম তখন আবার মনের অবস্থা বিপরীত—একবার আন্দামানের জমিতে পা দিলেইত গেল আর তো কোন আশা নাই—মনের যখন এরূপ ওলট-পালট অবস্থা চলিতেছে তখনই ছাদের উপরে যাওয়ার ডাক পড়িল, আমরা সকলেই তখন আন্দামানের দৃশ্য দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলাম। উপরে যাওয়ামাত্রই জেলের দৃশ্য দৃষ্টিপথে সর্বাগ্রে পড়িল। দেখিতে অতি সুন্দর, বাহির হইতে জেলখানা বলিয়া মনে হয় না যেন কোন বড়লোকের বাড়ী অথবা বড় রকমের একটা মেস্ বা বোর্ডিং ; কিন্তু এই মাকালের ভিতর যে কি আছে তাহা পাঠকগণকে স্থানান্তরে জানাইব। আমাদেব প্রত্যেকেরই দেহ বিবস্ত্র করার হুকুম হইল। কেন হইল বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে কবিতে একটি লোক সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তখন অনুমান করিযা লইলাম আমাদে medical Examination শেষ হইল। আবার নীচে চানা চিড়া দ্বারা দু'দিনের উদরানল নির্বাপিত করিয়া যাত্রার শেষ যামিনী আজ জাহাজেরই খোলে কাটাইলাম। যাত্রাপথের পাঁচ দিবস এ ভাবেই শেয হইল। পর দিবস, পূর্বাকাশে উষার প্রথম চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার পর আমাদের একটা গান গাহিবার ইচ্ছা হইল—কোন্‌টা গাহিব এ বিষয় নিয়া সমালোচনার পর গানটা ঠিক হইল। কিন্তু রাগ-রাগিণী ও কণ্ঠস্বরে আমরা সকলেই কিন্নর, তবে খগেনবাবু এ সম্বন্ধে কিছু অভ্যস্ত ছিলেন, আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া পূর্ব নির্বাসিত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত গানটি গাহিতে চেষ্টা করিলাম।

(বেহাগ)

কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে,
এস কে কেঁদেছ নীরবে ;
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে,
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।

নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল,
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল ;
মাতৃকণ্ঠে যা বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্বল, সবল সে কি ভাবিবে।

জাননারে মূঢ়, জননী তোমার,
পুরাকাল হতে কি শক্তির আধার ;
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার,
নয়নে বিজলী খেলিবে।

ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি, এখনও কি ভাই,
মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই ;
হিন্দু-মুসলমান এস সবে ভাই,
মা যে ঐ ডাকিছেন সবে !

কে আজিও পরপদসেবী,
এস শীঘ্র এস মা'র পুত্র সবই ;
ধমনী ভিতবে একই রক্ত বহে,
একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে।

কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত,
মৃত্যু নির্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত ;
খণ্ড খণ্ড হয়ে, মার মুখ চেয়ে,
এস কে মরিতে পারিবে।

এস শীঘ্র এস, বেলা বয়ে যায়,
এনেছে জাপান ঊষা এশিয়ায় ;
মধ্যাহ্ন-গরিমা স্বাধীন ভারত,
আসিবে নিশ্চয় আসিবে।

(স্বামী প্রজ্ঞানন্দ)

সেলুলার জেলে প্রবেশ

আমাদের গানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে যাওয়ার হুকুম হইল। যার সঙ্গে যা-কিছু 'সম্পত্তি' ছিল তাহা নিয়াই ঔৎসুক্য চিত্তে অজানা অনিশ্চিত আনন্দের আশায় উপরে যাইয়া উঠিলাম। কখন আদেশ হইবে, কখন জেলে প্রবেশ করিব, কখন নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সাক্ষাৎ পাইব, কতক্ষণে তাঁহাদের নিকট দেশের অভিনব সংবাদ পৌঁছাইব—আজ বহু বৎসর যাবৎ যারা নির্যাতিত, নির্বাসিত, দেশের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য—শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্য রক্ষা ও পরিবর্ধিত করিবার জন্য, সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য, দেশকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ স্বাধীন করিবার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া আত্মাহুতি দিয়াছেন সেই সহোদরকল্প দেশপ্রাণ ভারতমাতার সুসন্তানদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইব এই আশাতেই মন নৃত্য করিয়া উঠিল। তাঁরা যে কিভাবে আছেন, তাঁদের দিন-যামিনী যে কিরূপে কাটে তাহা আমরা জানি না, দেশবাসী তাহার খোঁজ রাখে না সুতরাং তাহাদের অবস্থা কে বুঝিবে—"বুঝিবে সে কিসে, কি যাতনা বিষে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে" অনল যাহাকে দগ্ধ করে নাই সে কখনও অনল-দগ্ধ জ্বালা উপলব্ধি করে নাই, অনলের দাহিকাশক্তি সে কখনও অনুভব করিতে পারে নাই—আজ তাঁহাদের মরম বেদনা তাহারাই জানে যাহারা ভুক্তভোগী—সেই স্বাধীনতা-মন্ত্র-প্রবর্তক ঋষিগণের সাক্ষাৎ পাইবার আশায় মন আজ উৎফুল্ল। যাঁহারা অগ্নিযুগের স্রষ্টা আজ তাঁহাদের দর্শন লাভ করিব এই উল্লাসে আত্মহারা—তীর্থক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইয়া শ্মশানক্ষেত্রের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সতীর্থদের দর্শনলাভে নয়ন-মনের তৃপ্তিসাধন করিব,—বহুদিনের জমাটবাঁধা গোপন আশা মিটাইব, ইহাই চিন্তাস্রোতের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিল। আজ আর অন্য কোন কথাই মনে হয় না, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি—হারা ধন কখন পাব, কোন শুভ মুহূর্তে মায়ের খাঁটি সুসন্তানদিগকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দিয়া শান্তিলাভ করিব এই ভবিষ্যৎ চিন্তাই আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। এই অপূর্ব আনন্দের জন্যই মন নাচিয়া উঠিল।

উপর হইতে আমরা আমাদের সম্পত্তিগুলি ঢিল ছোঁড়ার ন্যায় "ধপাধপ্" জালি-বোটে ফেলিয়া দিয়া একটু হাল্‌কা হইলাম—পরে যে চন্দ্রনাথের চূড়ায় একবার আরূঢ় হইয়াছিলাম সেই স্থান হইতে ক্রমে অবতরণ করিয়া উক্ত জালি-বোটে আসিয়া নামিলাম। তরীখানা তীরে সংলগ্ন হইল, মালপত্র সঙ্গে করিয়া এই প্রথম আন্দামানের জমিতে পদার্পণ করিলাম। প্লাটফর্মে মেলার জানোয়ারের ন্যায় বসিয়া আছি, কিছুক্ষণ পরেই আন্দামানের ডেপুটি কমিশনার লুইজ সাহেব সকলকেই নিরীক্ষণ করিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্টর আমাদের চার জনকে রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিল।

আজ জেলে প্রবেশ করিতে হইবে। জেল পাহাড়ের টিলার উপর অগ্রসর হওয়ার হুকুম হইল, প্রায় এক মাইল আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া জেলের রাক্ষসদ্বারে বোঝা মাথায় করিয়া উপস্থিত হইয়া আগমনবার্তা জানাইলাম। চারি দিবস আমাদের আহার নিদ্রা ছিল না, সমুদ্রযাত্রায় শরীর দুর্বল। এমন অবস্থায় সকলেরই জিনিষপত্রসহ পথ অতিক্রম করিতে অতি কষ্ট হইল। কষ্ট হইলে কি হইবে, কিছু বলার উপায় নাই, এ যে মার্শেল আইনের দেশ—ঘাটে যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল যেন মুখ খুলিলেই shut up seven days standing handcaffs, যাক্ এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে পাঠকগণকে অনেক দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে দিতে পারিব! একবার জেলে প্রবেশ করিয়া নেই। জেলের সম্মুখে আসিয়াই দেখিলাম রাক্ষসদ্বারের উপরিভাগে অর্ধ-বৃত্তাকারে বড় বড় অক্ষরে লেখা সেলুলার জেল। আন্দামান যে নির্যাতনের সেরা স্থান এ ধারণা পূর্বেই ছিল, আজ এই জেলের নাম দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। এই জেল যে কেবল কারাগর্তে পূর্ণ উহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না, প্রেসিডেন্সী জেলের ৪৪নং ডিপীর মত চিরকালই cel'-এ বাস করিতে হইবে ইহা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইলাম। জাহাজ হইতে জেলের বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা যে খাঁটি মাকালের ন্যায় উহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। কারাগারের বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, একে একে আমরা আশি জন প্রবেশ করিলাম। এখানে আর ছয় জন নারীকে প্রবেশ করিতে হইল ফিমেল জেলে। সে জেল এখান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে।

আমাদিগকে যেন চিনিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বুদ্ধি খরচ করিতে ত্রুটি করিলাম না—আমরা সমস্ত গোলমালের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। কিন্তু সরকারের দৃষ্টি আমাদের উপর কোন দিনই কম নহে। এ দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার জন্য আমরা শত চেষ্টা করিয়াও মুক্তি পাই নাই। হট্টগোলের মধ্য হইতে আমাদিগকে সহকারী জেলার Mr. Waggon বাছিয়া বাহির করিয়া চারি জনের নাম লিখিয়া লইয়া গেল। এতক্ষণ আমরা অন্তর্জগত (জেল) ও বহির্জগতের (বাহিরের) সন্ধিস্থলে ছিলাম এবার জেলে প্রবেশ করিয়া একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া স্থান পাইলাম। এখানে সকলেরই তালাসী লওয়া হইবে। বৃত্তাকারে সকলেই আপন আপন বিছানা খুলিয়া attention-এর position-এ দাঁড়াইলাম। তালাসী নিবার জন্য জেলের হাওয়ালদার, জমাদার, টিণ্ডেল, পেটি অফিসার, ওয়ার্ডার প্রভৃতি ফৌজ ক্রমে ক্রমে যমদূতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এ তালাসী শুধু টাকা-পয়সার গোলা-বারুদের নহে। জেলে একটা নিয়ম আছে যদি কোন কয়েদীর নিকট অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অর্ধাংশ বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের কোষাগারে জমা হয়। এই অর্ধাংশের লোভেই তালাসীর এত কড়াকড়ি। আমাদের সঙ্গে কিছুই নাই কেবল একখণ্ড ভারতের মাটি। শুধু উহা রক্ষা করার জন্যই আমাদের একটু সাবধান হইতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আমাদের তালাসীর ভয় আর কিছুই ছিল না।

আমরা জাহাজে খাইবার জন্য যে চানা, চিড়া, চিনি পাইয়াছিলাম তাহার উদ্বৃত্ত যাহা ছিল তাহা অগ্নিযুগের ঋষিদিগকে খাইবার জন্য দিব এই আশায় উহা আমাদের সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কিন্তু উহা জেল তালাসীর আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, সুতরাং আশা আর পূর্ণ হইল না—চিরকালের জন্যই বুঝি অপূর্ণ রহিয়া গেল। এই তালাসীর জন্য সহযাত্রীদের কাহারো কাহারো উত্তম মধ্যম অর্ধচন্দ্র লাভ করিতে হইয়াছিল। যাহাদের সঙ্গে কিছু টাকা-কড়ি ছিল তাহারাই উহার ভাগী হইল।

আন্দামানে আসার কালে ভারতীয় জেল-পোষাক পরিবর্তন করিয়া আট হাত ধুতি, তিন কোয়াটার জামা এবং পাঁচ হাত লম্বা একটা পাগড়ী দিয়াছিল, আবার এখানে আসার পরই উহা কাড়িয়া লইয়া ভারতীয় জেলের অনুরূপ পোষাকই দিল। মাঝখানে পথে যেন লোক দেখাইবার ছলনার জন্য জামা-কাপড় দিয়াছিল! হিন্দুর উপর একটা অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা

দেখিলাম। যাহারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ (হিন্দু) তাহাদের হৃদয়ে ইহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল—ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন যজ্ঞ-সূত্রটি কাড়িয়া লইল। আজ সকলের চেয়ে আমাদের খগেনবাবুর হৃদয়েই বেশী আঘাত লাগিল। এরূপ অত্যাচার ইচ্ছাকৃত (intentional) নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। হিন্দুদের Dimoralised করিয়া হিন্দু-জাতকে ছোট করাই এ দেশের সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। আজ এখানে আসিয়া একটা বিষয়ে বড়ই হাল্‌কা হইলাম; যে ডাণ্ডাবেড়ী আজ নয় মাস যাবৎ পায়ে ঝুলিতেছিল, যে বেড়ী দিয়া পাঁচ পরদার ভিতরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল আজ সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম, আমরা সকলেই। যে লোকটি আমাদের পায়ের বেড়ী মুক্ত করিল সে মৈমনসিংহ জেলার একজন বাঙ্গালী নির্বাসিত মুসলমান ওয়ার্ডার উহার নাম সেখ ফিলু। তাহাকে বাঙ্গালী জানিতে পারিয়া এখানে bomb case-এর কোন আসামী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। বারীন্দ্রবাবুর নাম করিয়া বলিল, "তিনি এখানেই ১লা নম্বরে আছেন।" এমন সময় একটি পীপার ন্যায় উদর, মণিপুরী নাসিকা, দুষ্টা বিড়ালীর ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট কোলা ব্যাঙের মত কিন্তু তকিমাকার চেহারার শ্বেতাঙ্গকে আসিতে দেখিয়া হঠাৎ পালাইবার চেষ্টা করিল—তাহার এই পলায়ন পর প্রচেষ্টার মর্ম আমরা কিছুই উদঘাটন করিয়া উঠিতে পারিলাম না কিন্তু কল্পনাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম—এ জেলার। হাওয়ালদার আমাদের চারি জনকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া বলিল, এ চার জন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীও অনেক আছে, তবে শুধু আমাদের চারি জনকে দেখাইয়া একথা বলিল কেন? মনে করিলাম—"বাঙ্গালীর" পর হয়ত মৃদুকণ্ঠে আরও কিছু বলিয়াছে। হাওয়ালদার রাজকুমার আমাদিগকে পুনরায় রাক্ষস-দ্বারে লইয়া গেল, সেখানে আবার সেই তাসের Joker সদৃশ জেলার এবং সৌম্য ভাবাপন্ন থিওসফিষ্ট Mr. Daggon-এর সঙ্গে দেখা হইল। জেলার আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "Why do you join in the conspiracy" আমাদের পক্ষ হইতে উত্তর হইল—there is no conspiracy simply every one fights for his birth right। জেলার সাহেব আমার উত্তরের পর—mind that, it is not India. It is Andaman, we tame here Indian lions. If you behave well, you will be treated well, otherwise you will put into trouble to get the consequence 'finish' ভূমিকায় এই উপদেশবাণী নির্বিবাদে

শুনাইয়া হাওয়ালদারকে "দু নম্বর মে লে যাও" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল। দুই নম্বরই আমদানী নম্বর, দেশ হইতে নবাগতদিগকে এই নম্বরেরই প্রথম আসিতে হয়, স্থানাভাব হইলে অন্য নম্বরে (yard) রাখা হইয়া থাকে। এস্থানে আসার পর আবার তালাসী, আবার ঝুলনা-ঝারা ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শেষ হওয়ার পর আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার জন্য যাইতেছি এমন সময় দশটা বাজিয়া গিয়াছে, যে সকল লোক আবদ্ধ ছিল সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার মধ্য হইতে একটি ভদ্রলোক দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের সঙ্গে কোন বোম্‌কেসের লোক আসিয়াছে ?" উত্তর দিলাম, "কেন, একথা জিজ্ঞাসা করেন কেন ?" আমার এই প্রকার উত্তর শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি political prisoner" ? আমার 'হাঁ' উত্তর শুনিয়া আর প্রতিক্ষা না করিয়াই "পরে কথা হবে" বলিয়া তাড়াতাড়ি পালাইল। এত ভয়বিহ্বল চিত্তে কেন পালাইল তখন বুঝিতে পারি নাই। এরূপ ভাবে পালাইবার যে কারণ আছে তাহা জেল-শাসন প্রণালীর বর্ণনাকালে উল্লেখ করিব। আগামীবারে নবাগত নির্বাসিতদের অবস্থা পাঠকগণকে জানাইব।

নতুন আমদানী

যে সকল নির্বাসিতদিগকে আন্দামানে আনা হয় তাহাদের জেলে পৌঁছা পর্যন্ত অবস্থা যথাসাধ্য পাঠকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন নবাগতের বিশ দিবসের অবস্থাই বর্ণনা করিব।

ভারতীয় জেলের নিয়মানুসারে এক জেল হইতে অন্য জেলে স্থানান্তরিত হইলে ডাক্তারের পরীক্ষা (Medical Examination) না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজে দেওয়া হয় না। এখানে আসিয়া সেরূপ ব্যবহারই পাইব এ ধারণা আমাদের ছিল। চার/পাঁচ দিবস জাহাজে আমরা যে অবস্থাতে ছিলাম তাহা পাঠকগণ জানেন। এ অবস্থায় আমরা Hospital treatment পাওয়ার যে উপযুক্ত নহি ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। দশটার সময়ই এখানে খাবার আসিয়াছে, যেই আহার শেষ করিয়াছি কাহারও বা শেষ হয় নাই, অমনি হুকুম হইল "আমদানীকা আদমি হিয়া জোড়া জোড়া বৈঠ্ যাও।" বসার পর আবার নীতি-উপদেশ "দেখো এ কালাপানী হ্যায়, মুল্লুক নেহি, কৈ আদমী গোলমাল মত করো, তব মাটিমে মিল যাওগে।" অমনি হুকুম হইল "উঠ্ যাও, এক এক আদমি এক এক লাকড়ি (২×½ কাষ্ঠ খণ্ড) লেকে এক এক কুঠিমে ঘুস যাও।" সকলের উপর এই common advice আর আমাদের উপর additional advice হইল "তোম লোক পহেলা চার কুঠিমে চার আদমি লাকড়ি লেকে ঘুস যাও, লেকিন ইয়াদ রাখ, তোম লোক কিসিকা সাথ বাত মত করো, তোম লোককা দোসরা বাঙ্গালীকা সাথ বয়ঠনা, বাতচিত কর না, একসাথ বয়ঠকে খানাপিনা মানা হ্যায়।"

এবার বাঙ্গালীর অর্থ যে রাজনৈতিক বন্দী উহা বুঝিলাম। এই আন্দামানে প্রসিদ্ধ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজনৈতিক বন্দীগণ প্রথম এখানে আসিয়াছিলেন সেই হইতেই বাঙ্গালীর অর্থ ওরূপ হইতেছে। এখানে হুকুম তামিল করিতেই হইবে কেউ মরে বা বাঁচে তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই—জাহাজে আমরা যে ধারণা করিয়াছিলাম আহা আর সত্য হইল না। আমরা প্রত্যেকে একটি লাক্ড়ি লইয়া চারি কুঠিতে (cell) চারিজন প্রবেশ করার পর একটা মুগুড় ও কতকগুলি নারিকেলের ছোবরা আমাদের

সেলে রাখিয়া তালাবন্ধ করিয়া দিল। কেমন করিয়া কি করিতে হইবে কিছুই জানি না, বুঝি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলেই বসিয়া আছি, এমন সময় করাণ সিং নামক একজন যাবজ্জীবন নির্বাসিত ওয়ার্ডার আসিয়া কেমনে কি করিতে হইবে দেখাইয়া দিল। তদনুসারে প্রথম ছিলকাগুলি কাঠের উপর রাখিয়া মুগুড় দ্বারা পিটিয়া নরম করিলাম, পরে বাহিরের চামড়া এবং ভিতরের বুকাগুলি ফেলিয়া দিয়া জলে ভিজাইতে দিলাম। ভিজিয়া আসার পর আবার মুগুড় দ্বারা পিটিয়া পিটিয়া ভূষিছাড়া করিয়া সূক্ষ্ম তার বাহির করিলাম। প্রথম দিনেই হাত লাল হইয়া ফোসকা পড়িল। প্রথম দিবস এভাবেই কাটিল। চারিটার সময় আমাদিগকে খুলিয়া দিল. প্রত্যেকেই ৩।৪ আউন্স করিয়া তার বাহির করিয়াছে দেখিলাম। প্রথম দিবসই ইহা যে কালাপানী—ইহা যে দেশের বাহির—ইহা যে নির্যাতনের পিঠস্থান—ইহা যে মানুষ মারা যমদূতের রাজ্য তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। যার যাহা কার্যের ফল হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়াছি তখন ৪॥টা বাজিয়া গিয়াছে—৪॥টা হইতেই আহার্য বিতরণ আরম্ভ হয়। আমরা চারিজন পাশাপাশি বসিয়া আছি এমন সময় টিণ্ডেলের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িল. অমনি আসিয়াই হুকুম দিল "তোম লোক এক গাট্টা হোকে কবি মত বৈঠ, এ্যাসা বয়ঠেনেকা হুকুম নাহি হ্যায়।" আমাদের প্রতি দুই-জনের মাঝে ৪।৫ জন করিয়া লোক বসাইয়া আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দিল। একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপদে-বিপদে একে-অন্যের উপকার করিয়া ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিব, আজ এখানে আসা-মাত্রই আমাদের অটুট বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিয়া প্রাণের ভালবাসাকে বিলোপ করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম। দেশের জেলে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কারাগর্তে দিবারাত্রি আবদ্ধ ছিলাম সুতরাং ওটা সহ্য হইত। কিন্তু এখানে চোখের সামনে থাকিব—কথা বলিতে পারিব না; একই প্রাঙ্গণে আহার করিব—একে অন্যের পাশে বসিতে পারিব না; পাশাপাশি কারাগর্তে বাস করিব 'টু'শব্দ করিতে মানা. চার হাত দূরে বসিয়া থাকিব আলাপ করা নিষিদ্ধ! মনে হইল এ অতি অমানুষিক, অযৌক্তিক ও কল্পনাতীত অত্যাচার—ইহা শরীরের উপর অত্যাচার নহে—মনের উপর! এ নির্যাতন মনের! ভারতবাসী যদিও আন্দামান সম্বন্ধে কিছু জানে না, তথাপি তাহাদের নিকট আন্দামানের নাম করিলে তাহাদের হৃদয়ে একটা বিভীষিকার ভাব জাগিয়া উঠে; একে

একে আজ প্রথম দিনেই তাহার মর্ম্মানুভব করিতে লাগিলাম। "বিপ্লব-বাদীদের প্রতি সরকারের ব্যবহার" নামক অধ্যায়ে এ সমস্ত বিষয়ের এক বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

সপ্তম দিবস ক্রমে আমাদের উপর একটার পর অন্যটা এভাবে আইন জারি হইতে চলিল। সপ্তম দিবস আমদানীর ডাক্তারী পরীক্ষা (medical examination)। Major Murray আমাদের পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেককেই শক্ত কাজের (Hard labour) উপযুক্ত মনে করিল। আমার ওজন ৯৬ পাউণ্ড; ত্রৈলোক্যবাবুর ওজন ৯৪ পাউণ্ড; খগেনবাবুর ওজন ১০৪ পাউণ্ড এবং শচীনের ওজন ১০৮ পাউণ্ড। মহারাজ (ত্রৈলোক্যবাবু) বলিলেন, "I have got asthma." Major Murray উত্তর দিল, "you committed crime in the country, so you must suffer here" শচীনের টিকিটে mills if required এবং আমাদের তিন জনের টিকিটে লিখিয়া দিল Coir pounding অন্যান্য সহযাত্রীদের মধ্যে কাহাকে oil mills, কাহাকে Coir pounding ইত্যাদি লিখিয়া দিয়া বিদায় হইল। জেলে ইহাকে অর্থাৎ এই পরীক্ষাকে 'মুলাজা' বলে। 'মুলাজা' শেষ হইয়া গেল। নম্বরে আসিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মানুসারে আহারের পর আপন আপন কাজে প্রবৃত্ত হইলাম আমাদের এই ছোবার কাজকেই Coir pounding বলে। প্রত্যেককে প্রতিদিন দুই পাউণ্ড অর্থাৎ এক সের পরিষ্কার তার ছোবরা হইতে বাহির করিয়া দিবার নিয়ম। আমরা সকলেই অনভ্যস্ত সুতরাং আমাদের দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় না এ জন্য প্রতিদিন কথা শুনা, তিরস্কার ইত্যাদি চলিল; আমাদের চারি জনকে একটু খাতির করিল নতুবা আর সকলেরই উপর লাঠিটা, লাথিটা, গুতাটা পড়িল। আমাদের যে খাতির করিয়া ছাড়িয়া দিল তাহা নহে, ভয়ে, বাঙ্গালীকে (political prisoner) এখানে বড় হইতে ছোট সকলেই ভয় করে—সেজন্য। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বতন যে সকল বিপ্লবপন্থী এই প্রাঙ্গণে ছিল ক্রমে গোপনে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল—তাহাদের নিকট হইতে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম! এখানে প্রথম যাহাদের সঙ্গে পরিচিত হই তাহার মধ্যে শিবপুর ডাকাতি মোকদ্দমার শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, শ্রীমান যতীন্দ্র নাথ নন্দী; বালেশ্বর খণ্ড-যুদ্ধের শেষ চিহ্ন ৺জ্যোতিষচন্দ্র পাল এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ইন্দ্র সিং,

৺রোড়া সিং ও ৺লোরিয়া সিং। এখানে যাহাদের নামের পূর্বে মৃত-চিহ্ন আছে তাহাদের বিবরণ পরে উল্লেখ করিব।

সপ্তদশ দিবসে Chief Commissioner-এর অফিসে 'মুলাজার' জন্য যাইতে হয়। সেখানে নাম, ধাম, থানা, জিলা, বিচারালয় ইত্যাদি পরিচয় দিতে হইল। সমস্ত কয়েদীকে অপরাধের পরিমান অনুসারে এইখানে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকে, যথা ; Dangerous, Ordinary ও Stargang। Dangerous গোল টিকিটে, Ordinary সোজা টিকিটে এবং Stargang তোক্‌মা 39324 পাইয়া থাকে। আমাদের গলায় গোলাকার টিকিটই পরাইল কারণ আমরা সরকারের উচ্ছেদ সাধনকারী চির বিদ্রোহী শত্রু! একথা যদিও আমরা অস্বীকার করি—কিন্তু সরকার যুদ্ধোদ্যমের মামলায় আমাদিগকে দণ্ড দিয়া ঘোষণা করিয়া দিল!

Chief Commissioner-এর অফিস যে স্থানে অবস্থিত উহাকে আন্দামানের রাজধানী (Capital town) বলে। ইহা যে দ্বীপে অবস্থিত উহার নাম Ross island। আমাদের এই অফিসে যাওয়ার পর কর্মচারী ও প্রভাবশালী কয়েদী কর্মচারীদের (influencial convict officers) মধ্যে রাজ-সৈনিক বিদ্রোহীদের দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা গেল। তাহারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেশের কথা সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা করিল। সকলকেই সহানুভূতি সম্পন্ন দেখিলাম। যাঁহারা আমাদের উপর বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন তাহাদের মধ্যে দুই জন প্রধান—একজন কাজিম হোসেন, B.A—ইনি Government forest Department-এর এক জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন, পরে কোন কারণে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড পাইয়া এখানে আসিয়াছেন। আর অন্য জন Henry—ইনি লঙ্কাদ্বীপের এক জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভদ্রলোক ইহারা দুই ভাই যাবজ্জীবনের জন্য এখানে নির্বাসিত। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে তাঁহারা সকলেই আমাদের মোকদ্দমার সংবাদ রাখেন। আমাদের warrent-এর সঙ্গে সঙ্গে রায়ের একটা নকল ও আর একটা Police Report আসে ; তাহা পাঠ করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস—Convict History, টিকিটে উল্লেখ করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাই সে সংবাদ রাখিবার কারণ। আজ আমরা এখানে বড় সাহেবের 'মুলাজা' শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ইহার দুই দিন পরেই আবার জেলার Barry সাহেবের মুলাজা ; যাহাদের টিকিটে

কাজ লিখা আছে তাহারা পাশে নাম দস্তখত করিল এবং যাহার টিকিটে কিছু লিখা নাই তাহার টিকিটে খ্যায়াল মত একটা কিছু লিখিয়া দিল। শচীনকে লিখিয়া দিল Cocoanut oil mill, শচীন তখন আপত্তি করিয়া বলিল, 'May I get any other work except it ?' ব্যাড়ি সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিল, 'It is the order of Superintendent ; what can I do', শচীন তখন আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া চলিয়া আসিল ; নম্বরে আসিয়া সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা হয় একটা করিবে এই ছিল তার ইচ্ছা। এই মুলাজা শেষ হইতে হইতেই আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দিবার হুকুম হইল। আমাদের চারি জনকে চারিটা প্রাঙ্গণে ভাগ করিয়া দিল। আমাকে ৪নং ; খগেনবাবুকে ১নং ; মহারাজকে ৫নং দিল এবং শচীনকে রাখিল ২ নম্বরেই, আজ হইতেই আমরা নাকি আন্দামান কয়েদী হইলাম। এখানে আসিয়া আর একটি নূতন ব্যবস্থা দেখিলাম। এখানে যে কয়জন বিদ্রোহী আছে তাহাদের রাত্রে থাকিবার ব্যবস্থা ১নং, ৭নং, ১৫নং, নীচের cell ; ৪নং, ১১নং, ২০নং মাঝের cell এবং ৬নং, ১৩নং, ২০নং উপরের cell। উপরের ১৩ নম্বরই হইল আমার। ইহা শুধু আমাদের জন্যই, অন্য সাধারণ কয়েদীর জন্য এরূপ কোন কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন নাই।

এই Chief Commissioner-এর মুলাজার দিন নবাগত নির্বাসিতদিগকে কার কত দিন জেলে থাকিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেয়। কম ছয় মাস এবং উর্ধ্বে 'farther order'। এই 'farther order' অর্থ দুই বৎসরের কম নহে এবং আজীবনও হইতে পারে। আমাদের দলে যতজন ছিলাম তাহার মধ্যে আমাদের চারি জনকে 'farther order'-এ বন্ধ করিল আর সকলকেই ছয় মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে।

বন্দীশালার সাধারণ বিবরণ

এই জেলের মাঝখানে চৌতালা একটা গুমটি (Central tower) আছে, তাহার চতুস্পার্শ্বে নানাভাবে সাতটি ত্রিতল ইষ্টকালয় আছে। প্রত্যেক তলেই এক শ্রেণীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ (cell)। এক একটি দালান লইয়া এক একটি পৃথক প্রাঙ্গণ (ward)। এই ঘুমটি central tower হইতে প্রত্যেক প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিবার জন্য প্রতি দ্বিতল ও ত্রিতলে দুইটি করিয়া সেতু আছে। আবার নম্বর ও হাসপাতালের মধ্যে আর একটি সেতু আছে। হাসপাতাল, অফিসও প্রধান-দ্বারের অতি নিকটে। এই হাসপাতাল হইতে যে-কোন প্রাঙ্গণে যাইতে হইলে কাহাকেও ভূমি স্পর্শ করিতে হয় না। প্রতি দুইটি প্রাঙ্গণের মাঝে একটি ইষ্টকালয়। একটির সম্মুখ এবং অন্যটির পশ্চাৎ এই দুইয়ের মাঝেই প্রাঙ্গণ; সুতরাং এক প্রাঙ্গণের সঙ্গে অন্য প্রাঙ্গণের কোন সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছা হইলে এক প্রাঙ্গণ হইতে গোপনীয় বা নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে যে আলাপ করিবে তাহার কোন সুযোগ প্রায় নাই বলিলেই হয়।

প্রতি প্রাঙ্গণে ৬৪—১৫৬টি করিয়া কারাকক্ষ আছে। এক একটি কক্ষ ৯×৭ হাত, সম্মুখ ভাগে ৪×১৷৷০ হাত একটি দ্বার এবং পশ্চাৎ ভাগে ২×১ হাত একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন। এক প্রাঙ্গণ হইতে অন্য প্রাঙ্গণের বিপ্লববাদী-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ও সংবাদের আদান-প্রদান করিতে হইলে এই বাতায়নের সাহায্যেই আমরা সরকারের আইন অমান্য করিতে পারি। এ বাতায়ন ভূমি হইতে প্রায় ছয় হাত উঁচুতে। প্রত্যেক কারাকক্ষের সম্মুখে দালানের সমপরিমাণ দৈর্ঘে চার হাত, প্রস্থে একটি বারান্দা আছে, রাত্রিতে পাহারাদাররা এই বারান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দিয়া থাকে। এই বারান্দার চতুর্দিক লৌহের গরাদ দ্বারা বন্ধ এবং সম্মুখ অংশে একটি দ্বার আছে রাত্রিকালে উহা তালাবন্ধ থাকে। প্রত্যেক প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি করিয়া টিনের কারখানা ঘর। সমুদ্রজলে স্নান করিবার জন্য ইষ্টকদ্বারা তৈরী নালার আকারে জলের হাউদি এবং এক এক পাশে ১০টি কি ১৫টি করিয়া মলমূত্র ত্যাগের স্থান আছে। পানীয় জল বাহির

হইতে আসে। সমস্ত বর্ষাকাল বৃষ্টির জল একস্থানে জমাইয়া রাখা হয়, উহা নলের (pipe) সাহায্যে জেলের মধ্যে আনিয়া রাখে, এই বর্ষাবারির সাহায্যেই নির্বাসিতের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

ভারতীয় সকল জেলেই কয়েদীর আহারের স্থান আছে। কিন্তু আন্দামানে তাহা নাই; এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় আট মাসই বৃষ্টি ধারার বিরাম নাই। অনেক সময় এমনও হয় যে ক্রমান্বয়ে এক মাসকাল অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা ঝরিতে থাকে। আহার করিবার স্থানাভাবে অধিকাংশ দিনই কারখানার পাশে দাঁড়াইয়া কম্পিত কলেবরে আহার্য গ্রহণ করিতে হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইলে অনেক সময় ডালভাতে বন্যার প্লাবন দেখা দেয়। কাহারো বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় আর কাহারো বা পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকিয়া যায়। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমরা মরার মত পড়িয়া আছি শুধু বাঁচার ইচ্ছাটা আমাদের মধ্যে প্রবল বলিয়া। আর মরার মত মরবার ইচ্ছা নাই বলিয়া; অথবা মরবার সাহস নাই বলিয়া সমস্ত নির্বাসিতই এই তিনটা কারণে যে আন্দামানে পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহার আভাস পাঠকগণ ক্রমে পাইবেন।

এক নম্বরে নারিকেল ছোবরা আর বেতের কাজ, দুই নম্বরে নারিকেল ছোবরা কলে পিসার জন্য সিদ্ধ হয়, সে জন্য Boiler Husking machine এবং সরিষার হাত কুলুর কাজ, তিন নম্বরে সরিষার পাকুলু, রামবাস, এবং coir pounding-এর কাজ, চার নম্বরে লোহার কারখানা ও সুতা রঙের কাজ, পাঁচ নম্বরে কাঠের কাজ, ছয় নম্বরে নারিকেলের হাত-কুলু এবং সরিষার পা-কুলুর কাজ আর সাত নম্বরে নারিকেল ছোলা ও নারিকেলের শাস খোলার কাজ হয়।

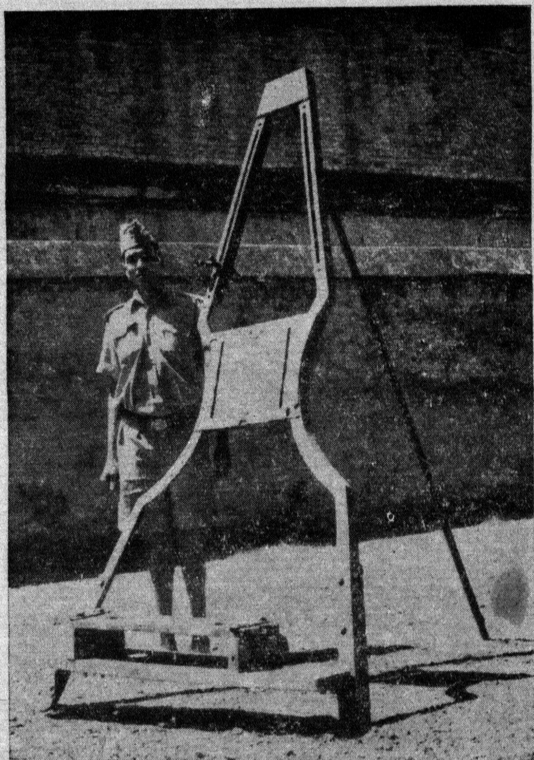
জেলের প্রাচীরগুলি ভারতীয় জেলের প্রাচীরের ন্যায় উঁচু নহে। উঁচু থাকার দরকারও করে না কারণ জেলের বাহির হইয়া যাইবে কোথায়। দেশে পার হইবারও উপায় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ভারতীয় জেলের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের।

শাসন বিভাগ

Major Marray I. M. S. জেল Superintendent, তিনি সপ্তাহে চারি দিবস জেলে আসেন। বাকী কয় দিবস তাহার সমস্ত আন্দামানের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে হয়। কারণ তিনি একাধারে জেল Superintendent এবং Senior Medical officer of Andamans, জেলের চারি দিবসের মধ্যে এক দিবস General parade,* এক দিবস Sanitation সমস্ত জেল ঘুরিয়া দেখে এবং চারি দিবসই জেল হাসপাতালে চোখ বুলায়। লোকটা বড় কড়া, লঘু গুরু যে কোন দোষই হউক না কেন তাহার নিকট ক্ষমা নাই, আর জেলার যাহা বলিবে তাহাই করিবে। জেল কর্মচারীদের শত অন্যায় থাকিলেও তাহার চোখে পড়ে না, অন্যায় করিয়াছে জানিয়াও তাহাদের পক্ষই সমর্থন করিবে। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সর্বদাই চটিয়া থাকিত, তাহাদের উপর বেপরোয়া ভাবে সামান্য দোষ পাইলেই গুরুতর দণ্ডের আদেশ দিত। যদি কোন মিথ্যা মোকদ্দমা জেলার তাহাদের বিরুদ্ধে সাজাইত তাহা জানিয়াও ছয় মাস চিঠি বন্ধ, ছয় মাস বেড়ি, ছয় মাস অল্প খানা—তাহাদের উপর এই দণ্ডাদেশ হইত। বেত্র দণ্ডের আদেশ দিতে তাহার হৃদয়ে মোটেই বাধিত না। তাহার সমস্ত দোষের মধ্যে মস্ত একটা গুণ ছিল Punctuality, অনেক বিলাত ফেরতদের মুখেও তাহার এ গুণের প্রশংসা শুনিয়াছি। আমরা যতদিন আন্দামানে ছিলাম তাহার মধ্যে একদিনও তাহাকে ঠিক সময়ের একটুও আগুপিছু হইতে দেখি নাই।

জেলার Barry সাহেবকে পূর্বে আন্দামানে জেল কর্মচারীদের overseer বলা হইত। ১৯১৯ সাল হইতে তাহাদের পদ জেলার। এই ব্যাড়ি সাহেব জেলের সর্বময় কর্তা। superintendent পর্যন্ত অনেক স্থলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে; এমন কি Chief Commissioner পর্যন্ত

* এক দিবসে সমস্ত বন্দীদের নালিশ শুনা হয় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে পরিদর্শন করে। চিঠি বা কোন আবেদন বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই দিবসই করিতে হয়।



Flogging Frame

(বেত্রাঘাতের যন্ত্র)

তাহার কথা একেবারে অবহেলা করিতে পারে না। জেলার নির্বাসিত-দিগকে অত্যাচার করিয়া জেলের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে এই কাণ্ডনের মোহেই সকল উপরতন কর্মচারীদের নিকট সে পেয়ারের পাত্র এবং সুদক্ষ কর্মচারী বলিয়া পরিচিত।

একজন অত্যাচারী, অত্যাচারেই যাহার আনন্দ, সে যদি এরূপ স্পর্ধা ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সুযোগ পায় তবে তাহার ক্ষমতা নির্বিবাদে খাটাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এখানে তাহার অবাধ অবারিত দ্বার। এখানে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া উপর ওয়ালাদের নিকট গোপন রাখিতে পারে। তাহাদের চোখে ধূলা দিতে পারে; তাহার বিরুদ্ধে মুখ খুলিবার সাহস কারো হয় না। যদি কেউ বেপরোয়া হইতে পারে—বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরই তাহার জীবন শেষ—একথা স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তবে একথা উপর ওয়ালাদের কানে মাত্র পৌঁছাইতে পারে। এমন অসীম সাহস কেউ করে নাই সুতরাং তাহার প্রতিকারও কখন হয় নাই। যা কিছু পরিবর্তন হইয়াছে উহা রাজনৈতিক বিপ্লববাদীদের দ্বারা, উহা তাহাদের কাহিনীর বর্ণনাকালে বিবৃত কবির। এই শাসন বিভাগের মধ্যে শুধু জেলার একাই যে এ প্রকৃতির তাহা নহে। প্রধান কর্মচারী যেখানে ভাল নিম্নতন কর্মচারীদের স্বভাব খারাপ হইলেও তাহাদের উপরওয়ালার গুণের প্রভাবে তাহাদের কতকটা ভাল হইতে হয়। কিন্তু এখানে Head of the department-ই নীতি-জ্ঞানহীন নিম্নতন কর্মচারীরাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই।

তাহার অধীনে যমদূত কালদূতের ন্যায় কতকগুলি অনুচর আছে। একজন বড় হাওয়ালদার, নাম তাহার রাজকুমার কিন্তু স্বভাবটা শয়তানের। দুই জন ছোট হাওয়ালদার এক জনের নাম লালারাম; আর এক জনের নাম জীবন। জীবনের মনটা গরলে ভরা হিন্দুর অপরাধটাই তাহার চোখে বেশী পড়ে কারণ সে জাতে মুসলমান। এই জীবনই এক সময়ে চাল চুরির অপরাধে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহা অবশ্য কয়েদীরই ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে। ইহাদের অধীন একজন নির্বাসিত জমাদার সে মাসিক আট টাকা বেতন আর সরকারী খোরাক পায়। ইহার নীচে প্রত্যেক নম্বরে একজন করিয়া Tindal, তাহাদের বেতন দুই টাকা, বকসিস্ দুই টাকাএবং খোরাক সরকারী। প্রত্যেক Tindal-এর অধীন দুই জন করিয়া Petty officer আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন বারো আনা

বকসিস্ এক টাকা এবং খোরাক জমাদার ও Tindal-এর অনুরূপ। এই সকল Convict officer-দের অধীন জেলে প্রায় আশি জন convict warder আছে। জমাদার, টেণ্ডেল, পেটি-অফিসাররা পালা অনুসারে জেলের কাজ দিনের বেলায় চালায়। রাত্রে বাহিরেই থাকে এবং স্বপাকে আহার করে কিন্তু আশি জন warder-দের বাহিরে যাওয়ার হুকুম নাই, তাহারা রাত্রে জেলে পাহারা দেয় এবং আহারাদি নির্বাসিতদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত করিতে হয়। এই জমাদার হইতে warder পর্যন্ত সকলেই নির্বাসিত। জমাদার, টিণ্ডেল ও পেটি-অফিসারের পোষাক (uniform) কাল, লাল পাগড়ী, জমাদারের একটা বেজ আছে তাহাতে পিতলের গোলাকার তোকমায় jamadar, টিণ্ডেলের তোকমায় tindal লেখা আছে। petty officer পর্যন্ত সকলেরই কোমড়ে একটা police head constable-দের ন্যায় চাপরাস আছে। warder-রা তিন মাস অন্তর একবার বাহিরে যাওয়ার ছুটি পায় একদিনের জন্য। ৪টার পূর্বে আবার ফিরিতে হয়। এই টিণ্ডেল ও পেটি-অফিসারদেরই সকল কাজ করিতে হয়। জমাদারকে শুধু বড় কর্তাদের পিছনে পিছনে কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সমস্ত কাজের জন্য টিণ্ডেল দায়ী। টিণ্ডেল ও পেটি-অফিসার তালা বন্ধ করিবে, কাজ আদায় করিবে, আমদানী রপ্তানী দেখাবে অর্থাৎ এক একটি নম্বরের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব টিণ্ডেলের। কণ্টকের সাহায্যে কণ্টক উঠাইবার ব্যবস্থাটা এখানে বেশ পাকা। কয়েদীর জন্য কয়েদীকে দায়ী করিয়া incharge কয়েদীদের মনে গোলামীর এমন ভীতি জাগাইয়া রাখিয়াছে যে ব্যাড়ি সাহেব যাহা বলিবে তাহা ছাড়া অন্য কিছু করার স্বাধীনতা তাহাদের আছে ইহা তাহাদের কল্পনাতীত।

এই convict officer নির্বাচন করার প্রথম হাত ব্যাড়ি সাহেবের। সুতরাং সে এমন লোক বাছিয়া নির্বাচন করে—যে অসম সাহসী—গোয়ার-গোবিন্দ, অর্ধসভ্য, শক্তিশালী, হিতাহিত-জ্ঞানহীন, চুকলিতে মুক্‌বরিতে ওস্তাদ এবং হুকুম তালিমে সর্বদা প্রস্তুত এমন লোককেই নির্বাচন করে; এইরূপ প্রকৃতির লোকের দ্বারাই অঙ্গুলী সঙ্কেতে কার্য হাসিল করিয়া লয়। ইহার ষোল আনাই পাঠান চরিত্রে বিদ্যমান। পূর্বে সমগ্র আন্দামানে পাঠান নির্বাসিতগণ একছত্রাধিপতি ছিল। সের আলী নামক এক পাঠান কর্তৃক ১৮৭২ সালে Lord Mayo নিহত হওয়ার পর সরকারের এ বিশ্বাস খর্ব হয়। পূর্বে খানসামা, পাঠান—গারোয়ান,

পাঠান—নৌবাহক, পাঠান—আর্দালী, পাঠান—জমাদার, টিণ্ডেল, পেটি-অফিসার, পাঠান। পাঠান যেন হলুদের গুড়া। হলুদের ব্যবহার যেমন সকল তরকারীতেই হয় সেইরূপ এই আন্দামানের সব কার্যেই পাঠান। পাঠান ছাড়া কোন কাজই চলে না। এই পাঠানপ্রীতি জেল ও বাহিরের সর্বত্রই ছিল। সরকারের এইরূপ সাহায্য পাইয়া এই পাঠানগণ স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং হিন্দুকে মুসলমান করিবার অবাধ সুযোগ পাইত। পাঠান চরিত্র বর্ণনাকালে তাহার ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিব।

ভোর পাঁচটার সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। এই ঘণ্টা বাজার অর্ধ ঘণ্টা পরেই ব্যাড়ি সাহেব সমস্ত সঙ্গপাঙ্গ নিয়া জেলে প্রবেশ করে। প্রত্যেক In-charge, Tindal ও Pety Officer কুঠির তালাগুলি খুলিয়া দেয়। রাত্রিকালে প্রত্যেক লাইনে (corrider) পাহারা দেবার জন্য যে চারি জন Warder থাকে তাহারা হুক্‌গুলি খুলিয়া দিলেই এক এক কক্ষ হইতে এক এক জন বাহির হইয়া জোরা জোরা (two by twos) চলিয়া যায়। সকল নম্বরের সংখ্যা যোগ করিয়া total মিলিয়া গেলেই ঠন্‌ করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। উহার পর আবরে নীচে যাইয়া প্রাঙ্গণে তিন ভাগে জোরা জোরা বসার পর টিণ্ডেল তাহার আপন নম্বরের মোট সংখ্যা ঠিক আছে কিনা তাহা দেখা হইলেই "উঠ যাও" হুকুম হয়। হুকুম হওয়ামাত্রই হাতমুখ ধোওয়ার ও মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য সকলেই দৌড়ায়। এই দৌড় competition-এর জন্য নহে—স্থান অল্প বলিয়া সর্বাগ্রে মলত্যাগের স্থান অধিকার করবার উদ্দেশ্যে এ দৌড়াদৌড়ি। আবার আর একটি বিপদ যে জলের হাউদির নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই গাঞ্জি (congi) অর্থাৎ জাউভাত আসিয়া পৌঁছে; অমনি "গাঞ্জি লেও. গাঞ্জি লেও" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ হয়। এ সময়ে দুদিকে টানাটানি। প্রাতঃক্রিয়াই শেষ করিবে, কি গাঞ্জিই লইবে; সময় অতি অল্প, আবার ষাট-সত্তর জনের মলত্যাগ করিবার জন্য মাত্র ছয়-সাতটি পায়খানার বন্দোবস্ত; সুতরাং প্রত্যেকের কার্য শেষ করিতে বহু সময়ের প্রয়োজন। গাঞ্জিওয়ালা অত সময় অপেক্ষা করে না উপস্থিত মতে যাহাকে পায় তাহাকে দিয়াই বিদায় হয়। যে আসিতে পারিল তো পাইল আর যে না পারিল তাহার ভাগ্যে আর জুটিল না। যদিও বা Tindal-এর নিকট গাঞ্জি পায় নাই জানায়, তবে পায়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লাভ হইয়া থাকে—ডাণ্ডার দুই-চার গুতা, আর অকথ্য ভাষায় অবিশ্রান্ত গালি।

গাঙ্গিবাটার শেষভাগে তাহারা আসিয়া পাইল। প্রথম যাহারা পাইয়াছে তাহাদের দুই-পাঁচ জনের আহার শেষ হইলেই "উঠ যাও" হুকুম হইল ; অমনি না উঠিয়া উপায় নাই। তাড়াতাড়ি নাকেমুখে দিয়া উঠিয়া আপন আপন দৈনিক কাজ করিবার জন্য হাতিয়ার-পত্র বুঝিয়া লইবার জন্য হুড়মার বাধিয়া গেল। এই হট্টগোলের মধ্যেই একজন আর একজনের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া দিল, অমনি টিণ্ডেল আসিয়া এক ডাণ্ডা এটাকে, এক ডাণ্ডা ওটাকে দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিল। সকলের আগে ভাল হাতিয়ার-পত্র সংগ্রহ না করিলে শেষভাগে খারাপগুলিই ভাগ্যে পরিবে, তাহার ফলে অতি কষ্টেও সম্পূর্ণ কাজ করা সমস্ত দিনেও সম্ভব হইয়া উঠে না। তালা খোলার পর অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজগুলি শেষ করিতে হয়।

৬টা হইতে ১০টা পর্যন্ত সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকে। ১০টার পরই স্নান আহারের সময়। যেই প্রাঙ্গণে বাহির হইল অমনি খানা বিতরণকারী খানা নিয়া হাজির। স্নানের সময় প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। যে নম্বরে সর্বশেষে খানা বিতরণ হয় সে নম্বরে কতকটা সময় ঘটিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্য নম্বরে এ সুযোগ মোটেই ঘটে না। বিদ্রোহী বন্দীদের সঙ্গে এ সকল সামান্য ব্যাপার নিয়া অধিকাংশ দিনই ঝগড়া বাঁধিত। আমাদের জিদ স্নান করিয়া খাবার নিব, পরে খাবার খাইয়া উঠিব। কিন্তু অন্যান্য নির্বাসিতগণ ভয়ে স্নান না করিয়াই খাবার খাইয়া শেষ করিয়াছে, এ দিকে উঠিবার হুকুম হইয়াছে, এমন সময় আমরা মাত্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিয়াছি, উঠিবার হুকুম হইলেও আমরা উঠি না। এ সকল ছোটখাট ব্যাপার নিয়া পাঠানদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনই একটা সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। এ সকল ব্যাপারে ব্যাড়ি সাহেবের যে কিছু ইঙ্গিত নাই তাহা নহে।

এই ১০টার পর ১২টা পর্যন্ত বিশ্রামের সময় কিন্তু কাজের চাপ এত বেশী যে এই ছুটির সময়ও কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অনেকে সম্পূর্ণ কাজ করিয়া উঠতে পারে না। এই ছুটির সময়টা কেবল নিয়মাবলীতেই লিপিবদ্ধ কিন্তু আন্দামান নির্বাসিতদের কারো ভাগ্যে উহা ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যে ভাবেই হউক ৪টার সময় যার শ্রমের মূল্য যাহা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার পরই আবার খাবার আসিয়া উপস্থিত। তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে আহার্য শেষ করিয়া আবার উৎসর্গের জীবের মত তিন ভাগে জোড়া জোড়া বসিতে হয়। তাহার পর ব্যাড়ি স্যাহেব

(lock up)-এর পূর্বে ঘুমটির চারিধারে সফর দেয় (চক্কর) তখন "সরকার" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। সে সময় সকলে যদি সমভাবে দাঁড়াইতে না পারে তবে কোন এক জনের অপরাধ বা অনভ্যাস জনিত ত্রুটির জন্য সকলকেই পাঁচ-সাত বার উঠাবসা করিয়া বৈঠকারী দিতে হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সম্মানের পাত্র তাঁহাদের এরূপ অকারণে দণ্ড ভোগ করিতে দেখিলে দুঃখ হইত। যাঁহার হুকুমে এক সময়ে সহস্র সহস্র লোক জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল, আজ তাহাকে একটা মূর্খ নীচ শেতাঙ্গের অঙ্গুলি নির্দেশে হুকুম তালিম করিতে হয়! এ অবস্থা যখন ভোগ করিতাম তখন সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত ; বোধ হয় এ অত্যাচারই আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শেষ সান্ত্বনা ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন এই উপসংহারে শেষ করিতাম।

সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে শুনি ও দেখি। যাহার স্বভাব ও প্রকৃতি নীচ, প্রবৃত্তি যাহার অপ্রশংসনীয়, যে ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসানের বিচার করে না, সে অন্যের প্রতি অত্যাচারজনিত দুঃখেই আনন্দ পায়। আমাদের ব্যাড়ি সাহেবের সমস্ত গোটা জীবনটাই সেরূপ। সতের বিপরীত, হিতের উল্টা, দুষ্টের সেরা সে। মল্লযুদ্ধে, বাক্যযুদ্ধে, আমোদ-কৌতুকে বা বিদ্রূপে একজন অন্যজনকে পরাস্ত বা পরাভূত করিলে বিজেতার আনন্দ হইয়া থাকে। বালক অবস্থায় ভালরূপ পাঠাভ্যাস হইলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সমশ্রেণী বা সমপাঠীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলে মনে স্ফূর্তি হয়, ইহা স্বাভাবিক। জয় লাভে আনন্দ হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ আনন্দ বিজেতা ও বিজিতের লাভ ও ক্ষতিতে। এখানে দেখা যায় একদিকে একটা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই ব্যাড়ি সাহেবের অত্যাচারে তাহার নিজের বা অত্যাচার প্রপীড়িতের কোন পক্ষেরই লাভ নাই—মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই—তাহার আনন্দ কারাগারের দম আটকানিবদ্ধ বায়ুর মধ্যে সদ্য ছিন্ন-শির পারাবতের ন্যায় মর্মান্তিক জাতনায়! কোন কোন কার্যে বোধহয় সয়তানকেও তাহার নিকট হার মানিতে হয়। সে যেন নির্যাতন ও নিষ্পেষণের অবতার—তাহার মন্ত্র যেন "পরিত্রানায় দুষ্কৃতাম্, বিনাশয়চ সাধুনাং।"

রাত্রিকালে তৃষ্ণা পাইলে নিবারণের উপায় নাই। সন্ধ্যার পূর্বে বন্ধ হওয়ার কালে সকলকেই লোহার বাটিতে একবাটি জল সঙ্গে করিয়া

কুঠিবদ্ধ হইতে হয়। কলাই বিহীন "লৌহপাত্রে পানীয় জল থাকিলে অল্পক্ষণ পরই উহার অবস্থা যে কি হয় তাহা সকলেই জানে। তৃষ্ণা পাইলে এই অপরিষ্কার জল পান করিয়াই তৃষ্ণাদেবীকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। আবার মলত্যাগের পর রাত্রিকালে এই জলের সাহায্যেই শুদ্ধ হইতে হয়। জেলে রাত্রিকালে মলত্যাগের হুকুম নাই, যদি এ আদেশ কেহ অমান্য করে তবে তাহাকে পাঁচ আইনে গ্রেপ্তার করা হয় ; তাহার ফলে সে দিবস তাহাকে সমস্ত দিন না খাইয়া কাটাইতে হয়। ইহাই পাঁচ আইন ভঙ্গের দণ্ড। প্রস্রাব ত্যাগের জন্য একটা অপ্রশস্ত মুখ ঘটির আকারের একটা ক্ষুদ্র পাত্র রাখে, দায়ে পরিলে উহাতেই উভয় কার্য শেষ করিতে হয়। কারাগর্ত (Cell) অন্ধকার ; কারণ এখানে বৎসরের আট মাস সর্বদা ঝড়বৃষ্টি থাকে, চন্দ্র সূর্যের হাসি মুখ খুব কম সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগকালে হিন্দুয়ানী ত্যাগ না করিলে উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে এখানে চাপের চোটে অনেক গোঁড়া হিন্দুর হিন্দুয়ানী নষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রায়তন অপ্রশস্ত মুখ একটি ঘট, যাহার মধ্যে সওয়া কি দেড় সের আন্দাজ জল ধরে, এরূপ একটা ক্ষুদ্র পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। অমানিশার গভীর অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে সেই আলকাত্‌রা মাখা পাত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় এবং ঠিক ঠিক মুখটি অতি কষ্টে খুজিয়া লইতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দু ধর্ম এখন ভাতের পাতিলে ও জলের ভিতরে।" এখানে তদপেক্ষা আরও ক্ষুদ্রা আকার ধারণ করিয়াছে। এখানে হিন্দুর সকল হিন্দুয়ানী নষ্ট হইয়া শুধু পানীয় জলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এখানে পানীয় জল জল-বিতরণকারী ব্যতীত অন্য কারো স্পর্শ করার হুকুম নাই। এই জল যদি কোন ব্রাহ্মণও স্পর্শ করে তাহা হইলেও মহা বিপদ। শুনিয়াছি যে এই জল ছোয়ার জন্য এখানে এক সময়ে নিতম্বদেশে ত্রিশ চাবুকও পুরস্কার পাইয়াছে।

জেলের আহারের কষ্টই সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯১২ সালে প্রথম যখন শ্রীমন্দিরে স্থান পাই তখন সাত দিবস এক প্রকার অনাহারেই ছিলাম। প্রত্যেক দিনই খাবার পাইতাম, কিন্তু গলাধঃকরণ সহজ ছিল না। যাহা দিত তাহার মধ্যে তৈল ও মসলা ছাড়া শুধু নুন ও জলে সিদ্ধ করা ডাল, আর বন-জঙ্গল দ্বারা তৈয়ারী একটা তরকারি এবং ধান ও পাথর মিশ্রিত কতকগুলি লাল ভাত। তরকারীর মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা ও বহু গবেষণার পর কিছুই চিনিয়া লইতে পারিলাম না। একটা কথা আছে ক্ষুধা থাকিলে নুন দ্বারাও খাওয়া যায়। কিন্তু এতে এমন একটা দুর্গন্ধ যে মুখে দেওয়া মাত্রই উগদার আসে, শকুনির গায়ের মত দুর্গন্ধ। ইহা ছিল ঢাকা জেলের অবস্থা। দ্বিতীয় বার যখন Presidency জেলে যাই তখনও ঠিক তেমন অবস্থাই দেখি। এই জেল খারাপ খানার জন্য Notorious। সকল জেলেরই অবস্থা এক। এই দাস্যাদি পাচনের ব্যবস্থা সর্বত্রই, তবে কোন কোন জেলে একটু নুন বেশী, কোন কোন জেলে একটু লঙ্কা বেশী এই পার্থক্য।

আন্দামানে রেঙ্গুনের আতপ চাউল, সপ্তাহে ছয় দিবস অরহর ডাল, এক দিবস অর্থাৎ রবিবারে মসুরীর ডাল এবং ভারতীয় জেলের মত সেই দাস্যাদি পাচন। এখানে দুই বেলাই অর্ধাংশ ভাত এবং অর্ধাংশ গমের রুটি। এখানে শুধু ভাত খাইলে শরীর ভাল থাকে না বলিয়াই ভাত ও রুটির ব্যবস্থা। আন্দামানের Penal Settlement-এর সৃষ্টি হইতেই এই একঘেয়া ব্যবস্থা চলিয়াছে। এই খাবার খাইয়াই অতি শক্ত শক্ত কাজ করিতে হয়। সহজ কাজ ও শক্ত কাজের জন্য আহারের পৃথক ব্যবস্থা নাই, সকলেরই এক। তরকারী যে সকল দ্রব্য দ্বারা পাক হইত তাহা আমাদের দেশের গরুতেও খায় না। কোন কোন দিন শুধু কচু পাতা সিদ্ধ করিয়া দিত। কোন প্রকারে উদরসাৎ করিলেই যে মুক্তি তাহা নহে ইহার পর আবার গলা চুলকানী। শুনিতাম সময় সময় খাবার উপযুক্ত তরকারীও আসিত কিন্তু শ্রীফল পাকিলে যেমন কাকের আশা নাই

তেমনি অবস্থা আমাদের। পাকশালায় (ভাণ্ডারীতে) আনা মাত্রই অমুক জমাদার একটা, অমুক হাওয়ালদার দুইটা, অমুক হাওয়ালদার তিনটা, এরূপ ভাবে হাতে-হাতেই শেষ হইয়া ইহার পর যাহা কিছু থাকিত তাহা কতক পাচকগণের পেটে আর কতক তামাকের মূল্যের জন্য উধাও হইয়া যাইত।

বাঙ্গলাদেশে সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন মৎস্য দিয়া থাকে। তরকারীর মধ্যে মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কাটা দেখিয়াই স্থির করিতে হয় যে আজ মৎস্যের দিন। এখানে তাহাও নহে ; তিন মাস কি চারি মাস অন্তর একবেলা সময় সময় মৎস্য দিয়া থাকে। এখানে সকল পাচকই হিন্দুস্থানী। যাহারা কোন দিন মৎস্য খায় না তাহাদেরই উপর পাকের ব্যবস্থা। তাহারা মৎস্যগুলি মসলাসহ গরম জলে ফেলিয়া মৎস্যের খিচুরী করিয়া ফেলে। ইহাতে এক টুকরাও আস্ত পাওয়া যায় না। চাতক যেমন বৃষ্টির ধারার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া থাকে কখন এক ফোটা বারি বর্ষিত হইবে—কখন তাহার তৃষিত প্রাণ শীতল করিবে এখানেও মাছখোর বাঙ্গালীর অবস্থা তেমনি। কবে মৎস্যের ব্যবস্থা হইবে, কবে তাহাদের শুষ্ক প্রাণে সলিল সিঞ্চন হইবে।

জলের ব্যবস্থা অদ্ভুত। সমস্ত বর্ষাকালের বৃষ্টির জল এক স্থানে জমাইয়া রাখা হয় তাহাই নল সংযোগে জেলে আসিয়া নির্বাসিতদের পানের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই পানীয় জলের মূল্য খুব বেশী। খাবার সময় এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যেকেই পাইবে। ব্যাড়ি সাহেবের রাজত্বে ইহার বেশী মিলিবার হুকুম নাই। অন্যসব কাজ সমুদ্রের জলেই করিতে হয়। এই জেলের ভিতরেই সমুদ্রের জল রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। এখানেও ভারতীয় জেলের ন্যায় ভোজপাত্রের একই ব্যবস্থা—সেই অল্প মূল্যের লৌহপাত্র।

জেলের ঘানি (মানুষমারা কল)

এই জেলের ঘানির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকের জীবনীশক্তি (vitality) ঘানির কাজেই অধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়া থাকে এবং অনেকের মূল্যবান জীবন এ নির্যাতনের ফলেই শেষ হয়।

জেলের মধ্যে ২, ৩ ও ৬ নম্বরেই ঘানির আড্ডা। ৩ ও ৬ নম্বরে সরিষার পা-কুলু আটটি, ২ নম্বরে সরিষার হাত-কুলু বিশটি এবং ৬ নম্বরে নারিকেলের হাত-কুলু চল্লিশটি। একটি পা-কুলুতে চারি জনকে সমস্ত দিনে ১২০ পাঃ সরিষা হইতে ৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ আধমণ এবং একটি হাত-কুলুতে দুই জনকে ৬০ পাউণ্ড সরিষা হইতে দশ সের তৈল বাহির করিতে হয়। ৬ নম্বরের একটি হাত-কুলুতে ৮৫ পাউণ্ড নারিকেল হইতে সমস্ত দিনে এক জনকে ৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ পনর সের তৈল বাহির করিতে হয়।

দেশ হইতে নবাগতদের মধ্যে যাহারা সবল এবং যাহারা ১১০ ধারায় দণ্ডিত অর্থাৎ পুরানো চোর—এখানে একবার করিয়া সেই মানুষমারা কলের বিভীষিকার কবলে তাহাদিগকে পড়িতেই হইবে। একবার সেই প্রাণঘাতি বিভীষিকার জালে পড়িলে তাহাতে জড়িত হইয়া মরনাপন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলার যো নাই। কোন আবেদন জানাইবার পূর্বে হুজুর বলা মাত্রই টিণ্ডেল, পেটি-অফিসারের ধমকানী, ব্যাড়ি সাহেবের চোখ-রাঙ্গানী আর মাড়ে সাহেবের গাম্ভীর্য দেখিয়াই আবেদন জানাবার প্রবৃত্তি দমিয়া যায়।

জবরদস্তি করিয়া ঘুরাইতে থাকে এ অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া ভূপাতিত হইলেও পরিত্রাণ নাই—মাটির উপর মৃত গোবৎসের ন্যায় রগড়াইয়া চলিতে থাকে। যখন সংজ্ঞাহীন হয়, তৎপর 'কাজ করিতে নারাজ' এই অজুহাতে ব্যাড়ি সাহেবের নিকট উপস্থিত করে। মার্শেল-লর অবতার ব্যাড়ি সাহেবের নিকট তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মুখ খোলামাত্রই শার্দুলের ন্যায় গর্জন করিয়া তাহার ভীতিবিহ্বলচিত্তে ভয়ের মাত্রা এত বাড়াইয়া দেয় যে তখন আর তাহার মুখে কথা সরে না। ইহার পর যদি হাওলাত বন্ধ করার হুকুম হয় তবে উপস্থিত রক্ষা। তাহা না বলিয়া যদি "কামমে লাগাও" হুকুম হয় তবে তাহার অবস্থা From burning pan into the fire। কাজে লাগাইয়া যথার্থই যদি তাহার অক্ষমতা বুঝিতে পারে তখন Absolutily refusing to work in the oil mill সাজান মোকদ্দমা টিকেটে লিখিয়া বিদায় করিয়া দেয়। এখন হইতে তাহার প্রাণ অর্পিত হইল মাড়ে সাহেবের হাতে। মাড়ে সাহেব তাহার জেল কোডের নিয়মে সমস্ত ধারানুযায়ী এক ধার হইতে হাতকড়ি, এরো-বেড়ী, ডাণ্ডা-বেড়ী, মারভাত, বেত্রাঘাত ইত্যাদি দণ্ড দিয়া পরে ছয় মাস Seperate confinement with bar fetters and invalid diet untill further order আদেশ দিয়া রাখিয়া দেয়। এ সকল দণ্ডের সময় কাটিয়া গেলে আবার তাহাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। একাজ না করা পর্যন্ত অথবা তাহার জীবনলীলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নাই। আর তাহার উপর যদি ভগবানের নিতান্তই দয়া হয়, মরিয়া না মরে, রাম এমন অরিই যদি সে হয়, তবে তাহার এই অপরাধের জন্য তাহাকে বাহিরে Magistrate Court-এ পাঠাইয়া দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

পুরাতন নির্বাসিতদিগের মধ্যে অল্প লোকেই ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছে তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়াছে। এমন সাহসী লোকদের মধ্যে কেউবা চার বার, কেউবা সাত বার, কেউবা দশ বার পর্যন্ত কশাঘাতে (flogging) নির্যাতিত হইয়া নিজের জেদ বজায় রাখিতে পারিয়াছে। এই সকল জীবের মধ্যে দয়ালা, ফকিরা, হাজি, সুলু এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্ম প্রদেশীয়দের মধ্যেও এমন সাহসীলোক আছে তাহাদের নাম জানা নাই বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। দয়ালা হিন্দুর ছেলে; আন্দামানে অল্প বয়সে আসে এবং এখানে পাঠানদের অত্যাচারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। এখানে

মুসলমান হইলেও সরকারী খাতাপত্রে হিন্দুই থাকে। আইন অনুসারে সরকাব তাহার খাতাপত্রে কোন পরিবর্তন করিতে পারে না।

নানারূপ ঘানির যে পরিমাণ তৈলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সে পরিমাণ তৈল যোগাইতে পারিলেই যে মুক্তি তাহা নহে। উহার উপর ব্যাড়ি সাহেবের তহরী আছে। প্রত্যেক ঘানি হইতে গড়ে তাহার জন্য ১ পাউণ্ড অতিরিক্ত তৈল লইবার গোপন হুকুম আছে। ইহা Superintendent জানে না। এই তৈলের জন্য সরিষা বা নারিকেল বেশী দেওয়া হয় না, যাহা দেওয়া হয় তাহা হইতেই শরীরের রক্ত জল করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভূষি (wax) পিশিয়া বাহির করিতে হয়। শেষ কালে এই ১ পাউণ্ড তৈল বাহির করিতে সমস্ত কাজের এক অষ্টমাংশ শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে।

ভারতীয় জেলে দুই জনের ৬টা হইতে ১২টার মধ্যে ১০ পাউণ্ড সরিষা হইতে তৈল দিতে হয় সাড়ে তিন সের। এবং অপর দুই জনের ১২টা হইতে ৫॥টার মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ সরিষা হইতে সমপরিমাণ তৈল দিয়া থাকে। যাহারা কুলুতে কাজ করে তাহাদের এক বেলা ছুটি—অতি হালকা কাজ করিতে হয়। আন্দামানে তাহা নহে, সকলেরই ৬টা হইতে ৪॥টা পর্যন্ত কাজ করিতে হয়। বঙ্গীয় জেলে এক মাসের বেশী এক জনকে ঘানিতে রাখে না, কিন্তু এখানে কারো কারো উপর-এত অবিচার হইযা থাকে যে চার থেকে সাড়ে চার বৎসর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঘানির কাজে রাখা হইয়া থাকে। এ সকল কারণে যাহার পরমায়ু ৬০ বৎসর তাহার ৪০ বৎসব বয়সেই জীবনের শেষকাল উপস্থিত হয়। একবার একজন নবাগতকে ঘানির কাজে দিলে তিন মাসের পূর্বে সে কোন কথাই বলিতে পারে না। আর বাহির হইতে যে সমস্ত পুরাতন নির্বাসিত দণ্ড পাইয়া আসে তাহারা ছয় মাসের পূর্বে কোন কথা বলিতে পারে না। এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কেহ ব্যাড়ি সাহেবের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থী হয় তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা হয় কুবাক্য ও গালাগালি দ্বারা। কোন ধর্মভীরু যদি খোদা বা মালিকের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তাহার উত্তরে "হিয়া খোদা কই নেহি হ্যায়, হাম খোদা—হাম মালিক হ্যায়" এই কথা বলিয়া তাহার ধর্মভীরু প্রাণকে অস্ত্রহীন করিয়া দেয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস. উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, গণেশ দামোদর

সাভারকর, নারায়ণ যোশী, ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল, শচীন্দ্র নাথ সান্যাল প্রভৃতিকেও ঘানিতে কাজ করিতে হইয়াছে। বারীন্দ্রবাবুর যখন ৯৬ প্যাউণ্ড ওজন তখনও তাহাকে এ কাজে রাখা হয়। জেল আইন অনুসারে যে—যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে তেমন কাজই দিতে হইবে। আন্দামান সরকার এই সকল লোককে কোন্ বিচারে যে ঘানির উপযুক্ত মনে করিল তাহা বুঝা শক্ত হইলেও ভুক্তভোগিরা বুঝিয়াছিল যে নির্যাতনের নিষ্পেষণে তাহাদের জীবনকে অকর্মন্য করিয়া দেওয়া—আর কোনদিনও যেন তাহাদের মনে ভারত স্বাধীনতার স্পৃহা না জাগে, সে প্রবৃত্তি যেন তাহাদের না হয়—এ উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে ঘানিতে দিত।

তৈল ওজনের ভার একজন Convict Warder-এর হাতে। সে যেন ব্যাড়ি সাহেবের পালকপুত্র। তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশই ব্যাড়ি সাহেবের নিকট বিকায় না—তাহার বিরুদ্ধে সবই অবিশ্বাসযোগ্য। ইহার প্রধান কারণ প্রত্যেকের নিকট হইতে ওজনের সময় ১ পাউণ্ড তৈল অতিরিক্ত আদায় করা এবং তাহা সকলের নিকট গোপন রাখা। কম হইয়াছে জানাইলে কেউ যদি বিশ্বাস না করে এবং তাহার প্রতিবাদ করে অমনি যমদূত-কালদূত আসিয়া টুঁটি চাপিয়া বলে, "শালা হামলোক ঝুটা বলতা হ্যায়" ইহার পর আর কারো 'টু' শব্দ করার সাহস থাকে না। এতদ্ব্যতীত ওজনকারীকে মাসে মাসে কিছু দক্ষিণা না দিলে প্রায়ই তৈল কম হইবে। এত শোষণের মধ্যে নির্বাসিতদের টিঁকিয়া থাকা কত কষ্ট তাহা পাঠক একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

পূর্বে এই ঘানিওয়ালাদের উপর এমন অত্যাচার চলিত যে নির্দিষ্ট কাজ পুরা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কাজে রাখিত এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে অভুক্তাবস্থায় থাকিতে হইত। জেলের নিয়ম অনুসারে সর্বত্রই রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে, কিন্তু পূর্ব দিবস তৈল ঠিকমত না হইলে রবিবারে পর্যন্ত তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব দিবসের প্রতিশোধ লওয়া হয়। অনেকে দণ্ডের ভয়ে, বেত্রাঘাতের আতঙ্কেই রবিবারে কাজ করিতে রাজি হয়।

দেশের সঙ্গে আন্দামানের কোন নিকট সম্বন্ধ নাই; সে জন্যই ব্যাড়ি সাহেব যাহা খুসী তাহাই করিয়া থাকে। সে জানে যে তাহার কোন কথাই বাহির হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর বুদ্ধির কাছে এ বিষয়ে তাহাকেও হার মানিতে হইয়াছে। পূর্বে এই মানুষ মারা কলের অত্যাচার দীর্ঘকাল

ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতে করিতে অনেকে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে, আর কেহ বা নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রতি মাসেই ঘটিত, কিন্তু তাহার কোন প্রতিকার হইত না ; উপরওয়ালাদের নিকট জানাইলে তাহারা শুনিয়াও শুনিত না। যাহার মনুষ্যত্ব আছে সে এ-সকল দেখিয়া দুঃখই প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ব্যারি সাহেব অম্লান বদনে নির্ভীকভাবে আরও ইন্ধন যোগাইত। এ-সকল ঘটনা Supdt. কি Chief Commissioner-এর নিকট জানাইবে এ সাহসও কাহারও হইত না। এই সকল ক্রমে পরিবর্তিত হইল বিপ্লববাদীদের সাহসের ফলে। এই সকল পরোপকারের ফলে তাহারা যে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিল তাহা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

কাজ করিয়া এসকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে—তাহার মাথায় যে কত রকম সয়তানী বুদ্ধি খেলিতে পারে তাহা অনায়াসেই অনুমেয়।

নাবালক ছেলেদের নিঃসহায় অবস্থার অসীম সাহস না থাকাটা অত্যন্ত দোষের নহে। তাহারা 'মামার জয়' বলিয়া যে দিকে সবল সে দিকেই আশ্রয় লইয়া থাকে। এরূপ জোর-জবরদস্তি করিয়া বহু সুকুমার মতি বালকদের সর্বনাশ করে। পূর্বে এই সকল ছেলেদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বিপ্লববাদীদিগের ক্রমাগত চেষ্টায় এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়া যায় এবং বারীনবাবু স্বয়ং এই সকল ছেলেদের রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার দেখিবার সুযোগ ছিল কেবল দিবা ভাগে, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকিত না। রাত্রিকালে নরপিশাচ ওয়ার্ডারগুলি তাহাদের খারাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইত। এ-সকল ঘটনা হাওয়ালদার কর্তৃক ধরা পড়ায় অনেকে দণ্ডও পাইয়াছে। যাহারা দণ্ড পায় তাহাদের "লাল উর্দি 'গেঙ' বলে।" বাহিরে লাল উর্দির যে গেঙ আছে তাহাতে প্রায় দুই শত ছেলে ও প্রৌঢ় থাকে। এ-সকল লোককে অত্যন্ত শক্ত কাজে রাখা হয়। এ-সকল অপরাধে এক পক্ষের দণ্ড হয় না, উভয় পক্ষই দণ্ডভোগ করিয়া থাকে; তবে দণ্ডের মাত্রার তারতম্য হইয়া থাকে।

এই সকল ছেলেদের মধ্যে সকলেই যে নৈতিক চরিত্রহীন তাহা নহে। অল্প বয়স্ক অজ্ঞান অবস্থায় হঠাৎ একটা কাজ করিয়া ফেলে। সেজন্য তাহাদিগকে মাতাপিতা ও সমাজ দেহের সঙ্গে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্বাসিত করা আমাদের নিকট বড়ই অবিচার বলিয়া মনে হয়। সমাজ দেহের সঙ্গে যদি অল্প বয়স হইতেই সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আকর্ষণের প্রভাব তাহাদের উপর পড়ে না, ক্রমে শোনিত সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়। যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা পরস্পর পরস্পরের সংবাদ লইয়া মাতাপিতার স্নেহ, জ্যেষ্ঠের ভালবাসা, কনিষ্ঠের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়। এ অবস্থায় তাহারা কূলহারা সমুদ্রমগ্ন জীবের ন্যায় হাবুডুবু খাইতে থাকে। সহায়হীন অবস্থায় পড়িলে মানব মাত্রেরই সাহায্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই সাহায্য পাইবার প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া হয়ত অনেক সময় নাবালক ছেলেরা রাক্ষসের মুখেও উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে সৎলোকের সংখ্যা দুই শত লোকের মধ্যে এক জন আছে কিনা

সন্দেহ, সুতরাং তাহারা সাহায্যের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে নির্যাতনই ভোগ করে। ছেলেদের কেহ যদি বিপ্লববাদীদের সংশ্রবে আসিয়া পড়ে তবে তাহার রক্ষা ; নচেৎ আর দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। আমরা তাহাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। জেলের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে যুবকগণ থাকে। এই জেলে নারিকেলের কাজ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। প্রায় একশত-দেড় শত লোক এখানে কাজ করে। নারিকেল খাইবার হুকুম যদিও নাই তথাপি অর্ধ প্রকাশ্যে কেহই বাদ দেয় না। গোরা পাহারা, টিণ্ডেল, জমাদার সকলেরই মুখ চলে। আর যাহারা একঘেয়ে খানা খায়, যাহাদের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না তাহারা হাতে খাবার জিনিষ পাইয়া সংযম শিক্ষা করিবে এরূপ আশা করা ভুল। এ-নম্বরেই তৈল গুদাম, এই গুদামের কর্তা ছিল একজন ওয়ার্ডার। সে জাতিতে পাঠান এবং চরিত্রেও পাঠান। জেলার তাহার অত্যন্ত বাধ্য ছিল। কারণটা অন্যস্থানে পাইবেন।

এই ওয়ার্ডে একটি বার্মা ছেলে ছিল, তাহার চেহারাখানা লাল টুকটুকে, মুখখানা কচি, ভাবখানা লাবণ্যযুক্ত। ইহার উপর অনেকেরই পৈশাচিক লোলুপদৃষ্টি ছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তৈল গুদামের ওয়ার্ডার, টিণ্ডেল, পেটি-অফিসার প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া কৃতকার্য হইতে পারে নাই। অবশেষে টিণ্ডেল (একজন পাঞ্জাবী মুসলমান অর্থাৎ পাঠানের ছোট ভাই) ও তৈল গুদামের ওয়ার্ডার উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ছেলেটি সর্বদা সাবধানে থাকিত। এমন কি বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কখনও একটুকরা নারিকেল স্পর্শ করে নাই। এই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্তরায় ছিলাম আমরা। আমাদের ভয়ে অনেক সময় তাহারা সাবধান হইয়া চলিত। এক দিবস প্রাতঃকালে অন্য একটি বরমা ছেলে নারিকেলের ঢেরি হইতে একটি নারিকেল ভাঙ্গিতে ছিল। ইহার অনতিদূরেই ঐ সুন্দর ছেলেটি দাঁড়ায়। তাহার নামটা স্মরণ নাই, মনে করিয়া লওয়া হউক তাহার নাম "ঠৌ"। টিণ্ডেলের দৃষ্টি সর্বদা ঠৌ-এর উপর থাকিত। কিন্তু কোনই ফাঁক পাইত না। সেইদিন সে অপর ছেলেটিকে নারিকেল দিয়াছে এই মিথ্যা অপরাধের জন্য তাহাকে পাকড়াও করিল। দুইজন ওয়ার্ডার তাহার দুই হাতে ধরিল এবং টিণ্ডেল তাহার সাধ্যানুসারে বৃথাই প্রহার করিতে লাগিল। এই নম্বরে যে সকল রাজনৈতিক বন্দীরা ছিল তাহারা হৈ চৈ করিয়া উঠিল,

তখন টিণ্ডেল আর অধিক প্রহার না করিয়া তাহার টিকিট আনিয়া বলিল যে তাহার নামে জেলারের নিকট report করিবে ; পরে তাহাকে cell বন্ধ করিয়া রাখিল। এদিকে আমাদের লোকেরা জেলারের নিকট এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল।

১০টা বাজিয়া যাইবার পর সকলেই আহার করিবার জন্য বাহির হইয়াছে ; 'ঠৌ'ও বাহির হইয়াছে। ঠৌ তখন একজন রাজনৈতিক নির্বাসিতকে বলিল, "আমার মাথা ঘুরাইতেছে।" তিনি তখন তাহাকে হাসপাতালে যাইবার হুকুম দেন। সে হাসপাতালে গেল ; ডাক্তার তখন ছিল না সুতরাং compounder তাহাকে detain করিয়া রাখিল। বৈকাল বেলা জেলার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দার জোয়ালা সিংকে ডাকাইল। তিনি সকল ঘটনা জেলারের নিকট বলিলেন। তখন উভয়ে হাসপাতালে যাইয়া 'ঠৌ'-এর জবানবন্দী লইল। তৎপর জেলার ডাক্তারকে পরীক্ষা করিতে ডাকাইল। ডাক্তার মারপিটের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না বলিয়া report দিল। তখন ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে 'ঠৌ'-কে মারা হয় নাই। এই সকল ঘটনার পূর্বেই টিণ্ডেল জেলারের নিকট বলিয়া আসিয়াছে যে 'ঠৌ' বেফাইল গিয়াছিল বলিয়া ফাইলে আসিতে বলায় বোমগোলা ওয়ালারা টিণ্ডেলকে ধমকাইয়াছে এবং গালি দিয়াছে। ডাক্তারের report শুনিয়া জেলার জোয়ালা সিংকেই মিথ্যাবাদী মনে করিল।

ইহার পর ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের লোকদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে ফন্দি আঁটিতে লাগিল। তাহাদের প্রধান সহায় ছিল জেলার ; সুতরাং তাহারা ভয় করিবে কাহাকে ? এক দিবস এই নম্বরে হুকুম দিল কেহ নারিকেল আহার করিতে পারিবে না। সরদার সের সিং বলিল, "যদি কেহই না খায় তবে আমরাও খাইব না।" ১১টার পর সের সিং দেখিল অন্য লোকেরা নারিকেল খাইতেছে, কিন্তু টিণ্ডেল কিছু বলিতেছে না। তখন সের সিং টিণ্ডেলকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখ আমিও নারিকেল খাইতেছি।" অমনি তেল গুদামের ওয়ার্ডার বারো-চোদ্দ জন মুসলমান-সহ দৌড়াইয়া মারপিট করিতে আসিল। সের সিং আকারে যেমন লম্বা-চওড়া কাজেও তেমনি সে একাই সকলের যম স্বরূপ, সুতরাং বেশী অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। অধিকন্তু আমাদের সকলেই যখন সের সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল তখন শুধু বাক্য যুদ্ধই সুরু হইল। এমন সময় গোরা পাহারা হাওয়ালদাররা আসিয়া গোলমাল থামাইয়া দেয়।

ইহার পর আমাদের সকলের বিরুদ্ধে riot করিতে প্রস্তুত বলিয়া case করিল এবং ছয় মাস ডাণ্ডা-বেড়ি ও নির্জন কারাদণ্ডের হুকুম দিল। যাহারা সাজা পাইল তাহাদের মধ্যে সর্দার সের সিং, জোয়ালা সিং, গুরুমুখ সিং, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ ইত্যাদি। পাঠক বুঝিতে পারিবেন ছেলের জন্য নরপিশাচরা কি না করিতে পারে।

নাবালক ছেলেরা যে লঘু পাপের জন্য গুরু দণ্ডের দণ্ডিত হইয়া থাকে তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটি চোদ্দ বৎসর বয়সের ছেলে সহ-পাঠিদের সঙ্গে বর্ষাকালে নৌকায় বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিবার সময় অপর একটি এগার বৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করে। ঝগড়া করিতে করিতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ছোট ছেলেটিকে ধাক্কা দেয়, তাহার ফলে সে খরতর স্রোতে পড়িয়া অতল জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই অপরাধের জন্য বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেয়। এ অপরাধের জন্য চোদ্দ বৎসর বয়স্ক ছেলের যে কি দণ্ড হওয়া উচিত তাহা আইনজ্ঞের বিচার্য বিষয়। আমাদের বিচারে গুরুদণ্ড হইয়াছে ইহাই বলিব।

এই অজানা সুদূর দেশে মাতাপিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছেলেদের আনিয়া কি দুরবস্থায় যে ফেলিয়া দেয় তাহা জানেন সৃষ্টিকর্তা আর জানে ভুক্তভোগী নিজে। আমরা কল্পনা দ্বারা এ দুঃখের উপলব্ধি করিতে পারি না। এই আন্দামানে কোন্ আশায় এবং কি অবলম্বনে তাহারা আত্ম-বিশ্বাসী হইতে এবং আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহার কোন উপায় আমরা দেখিতে পাই না—আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। এই গেল জেলের কথা, বাহিরের অবস্থা আরও শোচনীয়; সেখানে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই নাই। সেখানে কোন পৈশাচিক প্রেমিকের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কিছুতেই নানা আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। ভালমন্দ সকল কথা ভুলিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে।

স্বাস্থ্য ও জলবায়ু

বারীনবাবু তাঁহার নির্বাসিতের আত্মকথায় লিখিয়াছেন, "আন্দামান ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" এ কথা অতি সত্য ও খাঁটি। পানীয় জল যে কি ভাবে নির্বাসিতদের জন্য রক্ষিত হইয়া জেলে সরবরাহ হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখানে বৎসরে প্রায় আট মাস বৃষ্টি হয় তন্মধ্যে চার মাস অধিকমাত্রায় দেখা গিয়া থাকে। এখানকার স্বাস্থ্য জেলে ভাল থাকে একথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দেশে লোকের ধারণা, জেলেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, লোক ক্রমে জীবনী শক্তিহীন হয়। জেলে যেরূপ স্বাস্থ্য থাকে বাহিরে সেরূপ থাকে না। কারণ বাহিরের জলবায়ু জেল অপেক্ষা অধিক খারাপ। বাহিরের মৃত্যু সংখ্যা জেলের মৃত্যু সংখ্যার সহিত তুলনা হয় না। জেলের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া কেহ যেন ভুল না করেন যে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যকর স্থানেরই ন্যায় ভাল—ইহা আমাদের পক্ষে মন্দের ভাল।

ইহা অরণ্য পূর্ণ পাহাড়িয়া স্থান। বৃষ্টি পাইলে বনরাজি দৈত্যকুলের ন্যায় বাড়িয়া উঠে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই লোকাবাস পর্যন্ত আবৃত করিয়া ফেলে। জেলখানা চার পরদা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুতরাং তাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। এ কারণেই জেলের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল।

জেলের মধ্যে বাহিরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নির্বাসিতদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেটুকু পরিচ্ছন্নতার আবশ্যক তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি নাই। যাহারা কঠোর শ্রম করে, দিনের মধ্যে ১০ ঘন্টা ঘানির চাকা ঘুরায়, তৈল ও ঘর্মের মিশ্রনে তাহাদের জামা-কাপড়ের এমন অবস্থা হয় যে কিছুতেই তাহা পরিস্কার করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ আহারের বন্দোবস্ত কাঁচা লোহার থালায়। সর্বদা নগ্ন পদে থাকিতে হয়। মানসিক দুশ্চিন্তা বা অশান্তিও আছে। তৃতীয়তঃ জন্মাবধি যেরূপ জল-বায়ুতে বাস করিতে অভ্যস্থ তাহার অভাব। এ-সকল কারণেই কাহার কাহার স্বাস্থ্য মোটেই টিকে না। ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যেই ইহধামের লীলা শেষ

করিয়া তাহাদের চির-বিদায় লইতে হয়। এখানে প্রতি বৎসর এক হাজার থেকে বার শত পর্যন্ত নির্বাসিত আসে। এই নবাগতদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচাত্তর জনই তিরিশ বৎসরের মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এখানে আসার পর এক বৎসর জোর দুই বৎসর কেহ কেহ ভাল থাকে। ইহার পরই পেটের গোলমাল (অজীর্ণ রোগ) দেখা দেয়। সামান্য একটু অসুখ হইলে কাজের মাপ নাই। কোনরূপ একটু নিয়ম করিয়া বিশ্রামের অবসর পায় না। এ-সকল অসুবিধার জন্যও অনেক সময় সামান্য রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে। এক জনের হয়ত রাত্রে ১০২° বা ১০৩° উত্তাপ হইয়াছে। প্রাতে তাহার উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে যে রূপ শক্ত কাজেই থাকুক না কেন তাহার সে কাজ করিতে হইবে। তাহার কোন ওজর আপত্তি শুনা হয় না।

একটি পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আমার পাশে বসিয়া নারিকেলের ছোবরার কাজ করিতেছিল কিছুক্ষণ কাজ করার পর শরীর অসুস্থ বোধ করে। সে পেটি-অফিসারকে হাসপাতালে যাওয়ার ইচ্ছা জানায়। পেটি-অফিসার ছিল পাঠান, সে তাহাকে উত্তরে "সাবিরে কাহেকো নেহি গিয়া, কামান কনে নেহি সাকৃতে ইসি ওয়াস্তে এতি হাসপাতালমে জানে মাংতে, শালা বাহানা বানায়া কুট—কুট" বলিয়া ধমকাইয়া চলিয়া গেল। এ লোকটি তিন মাস ঘানিতে কাজ করিয়া আসিয়াছে, শরীর দুর্বল। তাহাদ্বারা এরূপ কাজ হওয়ার আশা নাই। ইহার ১৫।২০ মিনিট পরে আমাকে বলিল, "বাবুজি ! হামারা দিন ঘারবারা হ্যায়, চক্কর খাতে,—এ কথা বলিতে বলিতেই শুইয়া পড়িল। তখন সকলেই খবর পাইয়া আসিল। ইহার মধ্যেই তাহার শেষ কথাটুকু বলিয়া সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এরূপ ঘটনা অনেক হইয়াছে কিন্তু তথাপি সরকার পক্ষের বা medical officer-এর কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার এরূপ বহুবিধ কারণ আছে, বাহিরের অবস্থা বর্ণনাকালে তাহা বিবৃত করিব।

অবিশ্রান্ত বারিধারার মধ্যেই জেলে লোকের আহার করিতে হয়। বিশেষ অনুগ্রহ হইলে cell-এর বারান্দায় বসিয়া খাইতে পায়। বারান্দায় ১০।১৫ মিনিট পূর্বে খাইতে দিবে না। বৃষ্টি থামিলে বারান্দায় যাওয়ার হুকুম হয়। একটি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে এক-তৃতীয়াংশ লোকের জামা জাঙ্গিয়া ভিজিয়া যায়। এই ঠাণ্ডার সময় সেই ভিজা কাপড়েই

থাকিতে হয়। আর রবিবারে যদি দুই সেট কাপড়ই ভিজা থাকে তবে পরিবর্তন করিবার সুযোগ নাই। আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নত হইলে লোক যে অবস্থায় পড়ে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এখানে সরকার আমাদিগকে জোর করিয়াই তাহা শিক্ষা দেন।

খাদ্য যে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার একটা প্রধান কারণ তাহা খাদ্য অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

রাজনৈতিক নির্বাসিত

এই আন্দামানে সর্বপ্রথম ব্রহ্মের স্বাধীনতা হরণ করিয়া রাজা থিবোকে বন্দী করা হয়। এই সময় কতকগুলি স্বাধীনতা প্রয়াসী দেশ-প্রেমিককেও এই স্থানে নির্বাসিত করে। স্বাধীনতা প্রয়াসীর তপ্ত নিঃশ্বাস এই আন্দামানের আকাশে বাতাসে প্রথম তাহারাই ছড়াইয়া দেয়। তাহাদের অনেকেই এখানে শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহাদিগকে তিরিশ-বত্রিশ বৎসর অন্তর, যখন ব্রহ্মের স্বাধীন চিন্তাকে পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে তখন দয়া করিয়া Amnesty উপলক্ষে মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার পর তাহাদের এখানে অবস্থানকালেই দ্বিতীয় দফার রাজবন্দী আসে।

মনিপুরের যুদ্ধের পর মনিপুরের রাজভ্রাতা শূরচন্দ্র ও তাঁহার* সঙ্গে আরও কতজন নির্বাসিত হইয়া এখানে আসে। রাজভ্রাতাকে দেশে অর্থাৎ বৃন্দাবনে ফিরাইয়া নেয়, আর অবশিষ্ট এখনও এখানে আছেন। তাঁহাদের অপরাধ নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া যে তাঁহারা ইংরেজের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাইতে চাহিয়াছিলেন বা আত্ম স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও নহে। নিজেরা স্বাধীন ছিলেন, সেই স্বাধীনতা ইংরেজ কাড়িয়া লইতে গিয়া বাধা পাইয়াছিল। ইহাই তাঁহাদের অতি অমার্জনীয় গুরু অপরাধ।

ইহার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া স্বাধীনতা লাভ করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়া আর কোন লোক বহু বৎসর যাবৎ এখানে আসে নাই। ১৯০৮ সালের আলিপুর প্রসিদ্ধ যুদ্ধোদ্যম মামলার নির্বাসিতগণ ১৯০৯ সালে এখানে আসেন। পরে ক্রমে ক্রমে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা, খুলনা গ্যাঙ্‌কেশ, লাহোর সিডিসান কেশ, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, প্রয়াগপুর

* See the History of Monipur

ডাকাতি, শিবপুর ডাকাতি, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা, মালদহ খুন, ব্রহ্ম ষড়যন্ত্র মামলা ও রাজাবাজার বোমকেসের নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দিগণ এখানে আসেন।

বারীন, উপেন, হেম প্রভৃতি ইঁহারাই সর্বাগ্রে এই ঠিকানার অধিবাসী হন। বাঙ্গালী রাজনৈতিক বন্দী প্রথম এখানে আসেন বলিয়া তাঁহাদের ডাক নাম হইল "বাঙ্গালী"। বাঙ্গালী বলিলে সকলেই বুঝিয়া থাকে বোমাওয়ালা বা রাজনৈতিক আসামী। তাঁহারা এখানে আসার পর ব্যাড়ি সাহেবের সয়তানী-বুদ্ধি খুব বাড়িয়া গেল, তাঁহাদের জন্য একটা ওয়ার্ড ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা একই স্থানে থাবিবে কিন্তু কেহ কাহারও পাশাপাশি হইতে, কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে, এমন কি মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতেও পারিবে না। তাঁহাদের ভ্রমণের ব্যবস্থা একটা গোলাবর্তের চতুস্পার্শ্বে ; বিশ হাত দূরত্ব রাখিয়া ঘুরিতে হইত। আবার about turn বলিলেই একেবারে ঘুরিয়া চলিতে হইত।

এই সকলের তত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইল পাঠান ওয়ার্ডার। পাঠানদিগের সম্বন্ধে পূর্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ইহারা সভ্যতার কোন ধার ধারে না, ভদ্রতার কোন চিহ্ন তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় না, ইহারা একেবারে আস্ত বর্বরের জাত। এ জাতটা গোয়েন্দাগিরী ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে বড় পটু। এগুণের অধিকারী বলিয়াই তাহারা রক্ষক রূপে ভক্ষক হইয়াছে রাজবন্দীদের। তাহাদের ভাষা সকলেরই নিকট অপরিজ্ঞাত সুতরাং ভাবের আদান প্রদান করিয়া যে তাহাদের মধ্যে সভ্যতার আলোর বিকাশ করিয়া তোলা তাহা একেবারে অসম্ভব। অপর দিকে প্রলোভন। সরকার তাহাদিগকে tindal করিবে, জমাদার করিবে এ সকল লোভ দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভিতর থাকিয়াও তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। শুধু তাঁহারা পরস্পরে কথা বলিতে পারিবে না ইহাতেই শেষ হয় নাই। তাঁহারা অন্য সাধারণ নির্বাসিতদিগের সঙ্গে আলাপ করিলে উহা একটা গুরুতর অপরাধ। এ সকল কথা বারীনবাবুর "নির্বাসিতের আত্ম কথায়" পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। শাসন যন্ত্রের পেষণে তাঁহাদিগকে জোর করিয়া মূক করিয়া রাখার ইচ্ছাই বোধহয় এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ। ইহা যে একেবারে নিস্ফল হইয়াছে তাহা নহে। আমার এক বন্ধু তিন বৎসরকাল কাহারও সঙ্গে কথা বলেন নাই, তাহার ফলে প্রথম প্রথম তাহার মুখ হইতে কথা

বাহির হইত না। বাক্যেন্দ্রিয় অসাড় হইয়া গিয়াছিল। এখানেও সে উদ্দেশ্য যে থাকিতে পারে না তাহা বলা যায় না। যাঁহারা এই পেষণের মধ্যে নিষ্পেষিত হইতে ছিলেন নিম্নে তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিলাম।

মামলা ॥	নাম ॥
১) আলিপুর ষড়যন্ত্র (১২১ক ধাঃ)	শ্রীযুত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ শ্রীযুত হেম চন্দ্র দাস শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২) নাসিক খুন (৩০২ ধাঃ)	শ্রীযুত নারায়ণ যোশী।
৩) নাসিক ষড়যন্ত্র (১২১, ১২৪, ১৩১, ১২২ ধাঃ)	শ্রীযুত গণেশ দামোদর সাভারকর শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
৪) ঢাকা ষড়যন্ত্র (১২১ক ধাঃ)	শ্রীযুত পুলিন বিহারী দাস।
৫) রাজাবাজার বোমার মামলা	শ্রীযুত অমৃতলাল হাজরা।
৬) প্রয়াগপুর ডাকাতি (৩৯৫ ধাঃ)	শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী শ্রীযুত গোপেন্দ্রলাল রায় শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল শ্রীযুত ফণীভূষণ রায়।
৭) বালেশ্বর যুদ্ধ (৩৯২ ধাঃ)	৺ জ্যোতিষ চন্দ্র পাল।
৮) শিবপুর ডাকাতি (৩৯৬, ৩৯৫, ১২০খ ধাঃ)	শ্রীযুত নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ব্যাকরণতীর্থ শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র নন্দী শ্রীযুত সানুকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস শ্রীযুত নিখিল রঞ্জন গুহ রায় শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ দত্ত।

মামলা ॥	নাম ॥
৯) লাহোর ষড়যন্ত্র (১২১, ১২২, ১৩১, ১২৪, ১২৩, ধাঃ)	ভাই পরমানন্দ
	ভাই পরমানন্দ সৌরিয়া
	ভাই শিব সিং
	ভাই বিষন সিং
	ভাই বিষন সিং
	ভাই বিষন সিং
	ভাই বিষন সিং
	ভাই কৃপাল সিং
	ভাই ৺জোয়ালা সিং
	ভাই সোহন্ সিং
	ভাই পৃথ্বী সিং
	ভাই মদন সিং
	ভাই ভাল সিং
	ভাই নন্দ সিং
	ভাই ৺নন্দ সিং
	ভাই লোড়িয়া সিং
	ভাই ৺রোডা সিং
	ভাই উদম সিং
	ভাই ইন্দ্র সিং
	ভাই ইন্দ্র সিং
	ভাই মঙ্গল সিং
	ভাই নাধান সিং
	ভাই কপুর সিং
	ভাই গুরুমুখ সিং
	ভাই গুরদেও সিং
	ভাই কালা সিং
	ভাই প্যায়ারা সিং
	ভাই খোসাল সিং
	ভাই হৃদয় রাম
	ভাই সের সিং

মামলা	নাম ॥
	পণ্ডিত জগৎ রাম ভাই বাছাবা সিং ভাই লাল সিং লালা রাম সরণ ভাই হাজাড়া সিং ভাই বিশখা সিং ভাই ইন্দ্র সিং (গ্রন্থি) ভাই কেনার সিং।
১০) বরিশাল ষড়যন্ত্র (১২১ক ধাঃ)	শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক (গ্রন্থকার) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
১১) বেনারস ষড়যন্ত্র (১২১, ১২৪, ১২২, ১৩১ ধাঃ)	শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।
১২) মালদহ খুন (৩০২ ধাঃ)	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।
১৩) ব্রহ্ম ষড়যন্ত্র মামলা (১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৩১ ধাঃ) শেষ দল	ভাই হরদেও সিং ভাই অমর সিং ভাই ৺বুড্ডা সিং ভাই ৺ রাম রাক্ষা ভাই জীবন সিং মোঃ মহাম্মদ মোস্তাফা আলি আহাম্মদ মাঃ কৃপা রাম মাঃ কপুর সিং।
১৪) সিরাজগঞ্জ যুদ্ধ	মাঃ নিকুঞ্জবিহারী পাল মাঃ গোবিন্দচরণ কর।
১৫) রাজেন্দ্রপুর ৩৯৬, ৩৯৫ ট্রেন ডাকাতি	শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সেন।

মামলা ॥	নাম ॥
১৬) লাহোর খালসা কলেজের প্রধান শিক্ষককে ছোরা মারা (৩০২ ধাঃ)	ভাই চত্তর সিং।

প্রথম যাঁহারা এখানে আসে কিছুদিন জেলে রাখার পর তাঁহাদিগকে বাহিরে কাজ করিতে পাঠায়। জেলে যতদিন প্রথম বারে ছিল ততদিন কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু discipline সম্বন্ধে বড়ই কড়াকড়ি। শক্ত কাজ করিয়াও যদি দুইজনে একত্র হইয়া সুখ-দুঃখের কথা বলিতে পারিত তবে সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা পরিশ্রম বলিয়া মনে হইত না। এখানে মনের দুঃখ মনে চাপা দিয়া, হৃদয়ের আগুন হৃদয়ে পোষণ করিয়া দুঃখ ভোগ করা বড়ই অসহনীয়। মানুষের মনের অবস্থা ও শক্তি সকলের সমান থাকে না; সকলেই যে সকল যন্ত্রণা নির্বিকার ভাবে সহ্য করিয়া যাইতে পারে, দুঃখকেই যে সুখ বলিয়া মনে করিতে পারে তাহা নহে। শাসন সংযত কণ্ঠে মরম বেদনা মনে লুকাইয়া রাখিয়া যে ভাবে নিপীড়িত হইতেছিল তাহা কাহারও ব্যক্ত করবার সাধ্য নাই। একজন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলে অন্যে যে কিছু সাহায্য করিতে পারে তাহার কোন উপায় নাই। ৺ইন্দুভূষণের উদ্বন্ধনে প্রাণ হারাইবার ইহাও একটি কারণ। যদি কোন বন্ধুকে তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে দিত তবে তাঁহার অবস্থা ঐরূপ হইত না। আমরা আমাদের দেশভক্ত বীরবর ভাইকেও হারাইতাম না। সংবাদপত্র নাই, কাহারও সঙ্গে কাথাবার্তা নাই, দেশের আত্মীয়-স্বজনের বৎসরে একখানা চিঠি ব্যতীত দুইখানা নাই, বন্ধনের উপর বন্ধন, নির্যাতনের উপর নির্যাতন, নির্জনতার উপর নির্জনতা। যাঁহাদিগকে বাহিরে পাঠান হইল তাঁহারা নিগড়ের বাহির হইয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে বলিয়া মনে করিলেন। মনে করিলে কি হইবে শনির দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে পাঠাইল। কোন স্থানে দুই জনকে একত্র রাখিল না। বাহিরে জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আসিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য যে নষ্ট হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যে ভাবেই হউক কোনরূপ দুঃখে-কষ্টে তাঁহারা দিন কাটাইতে লাগিল। মুখের জোরে তাঁহারা যখন একটু সুবিধা করিয়া লইলেন তখন লালমোহন সাহা

নামক পরশ্রীকাতর একজন বাঙ্গালী তাঁহাদের বিরুদ্ধে গোপনে সরকারের নিকট একটা মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে Chief Commissioner-কে হত্যা ও তাহার অফিস উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা বিস্ফোরক (explosive) যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া C.C কোন সত্যের অনুসন্ধান না করিয়াই অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আজীবনের জন্য আবার জেলে বন্ধ করিয়া দিল। অন্যান্য সাধারণ নির্বাসিতগণ যদি বাহিরে কোন অপরাধ করে তবে তাহাদের বিচার আদালতে হয়, আদালতের বিচারে দোষী হইলে তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ করে বা অন্য কোন দণ্ড দেয়; কিন্তু এই রাজবন্দীদের কোন বিচার হইল না, তাহাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। জোর করিয়াই জোর-যার-মুল্লুক-তার প্রবাদের পরিচয় দিল। আজ পর্যন্তও উহার কোন মীমাংসা হইল না যে বাস্তবিক কোন দোষের জন্যই তাঁহারা অবদ্ধ হইয়াছিলেন কি না। যে দেশের বা স্থানের সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের কোন অংশের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ না থাকে তবে সে স্থানে যা তা করিয়া ধামাচাপা দেওয়া যায় তাহা এ ব্যাপারেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

বাহির হইতে জেলে আসিলে যে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয় তাহা পাঠকগণ পূর্বে জানিতে পারিয়াছেন, এখানে পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের রাজবন্দীগণও সে ব্যবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। তাঁহাদের প্রত্যেককেই ঘানিতে দিল। প্রথম যখন দেশ হইতে আসে তখন তাঁহাদিগকে হাল্‌কা কাজ দিবার হুকুম ছিল। এবারকার এ ব্যবস্থার আদেশ পাইয়া ব্যাড়ি সাহেব তাহার সম্পূর্ণ কেরদানি দেখাইয়া বাহাদুরী নিবার সুযোগ পাইল। বারীনবাবুকে যখন ঘানিতে দেয় তখন তাঁহার ওজন ছিল ৯৬ পাঃ, ক্রমে কমিয়া ৯২ পাঃ আসিয়া পৌঁছিল কিন্তু তথাপি তিন মাসের পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হইল না। এবার ব্যাড়ি সাহেব বুঝিল যে তাহার যথেচ্ছাচার চালাইবার এই উত্তম সুযোগ। যাহা খুসী তাহা করিলে C.C পর্যন্ত উচ্চবাচ্য করিবে না। বরং সন্তুষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। তাঁহাদের কাজে-কর্মে চলা-ফেরায়, ভোজনে-শয়নে যতদূর অসুবিধা হইতে পারে ব্যাড়ি তাহার চুরান্ত করিতে ক্রটি করিল না। এবার তাঁহাদের দুঃখের উপর দুঃখ বাড়িয়া যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহাদের উপর যে একদিন হঠাৎ কালের খড়্গ পড়িল, তাঁহারা ভারতীয় জেলে স্থানান্তরিত বা কারামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কোপ কখনও প্রত্যাহার হয় নাই। বহু বৎসর যাবৎ তাঁহারা এ জেলেই বাস

করিয়াছিলেন। বহুবার আবেদনের পর government বড় সদয় হইয়া আদেশ দিলেন যে তাঁহারা বাহিরের বেতনপ্রাপ্ত নির্বাসিতদের ন্যায় নিজের প্রাপ্য বেতনে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া নিজে পাক করিয়া খাইতে পারে। জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিলে বেত্রাঘাত পর্যন্ত ভোগ করিতে হইবে। পূর্বে নিয়ম ছিল কোনরূপ অপরাধের জন্য রাজনৈতিক নির্বাসিতদিগকে বেত্রাঘাত করিতে পারিত না; অর্থাৎ মরার উপর খাড়া ধরিবার হুকুমটিও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এ সময়ে তাঁহারা অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন। বারীন, হেম, উপেন, পুলিন, সুরেশ সেন, উল্লাস কর, ননীগোপাল, ইন্দুভূষণ ইত্যাদি এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও নারায়ণ যোশী। ইহাদের মধ্যে পুলিনবাবুর সম্বন্ধে হুকুম আসিল যে তিনি light labour এবং পুস্তক পাঠ ছাড়া অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। এখানে ব্যবস্থা হইল এক যাত্রায় পৃথক ফল। অল্প কয়টি প্রাণী এই বৃহৎ বন্দিশালার মধ্যে আছে; এক এক জনকে পৃথক করিয়া রাখিলে কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দেখিতে পায় না। এরূপ ভাবে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। বহু বৎসর পর তাহাদের দুরবস্থার সংবাদ বঙ্গীয় সংবাদপত্রে (Bengalee & Amrita Bazar Patrika) প্রকাশ হইল। ইহার পর তাঁহাদের উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থাটা আরও শক্ত হইল। দুঃখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল।

ইং ১৯১৪ সালে যখন বড় লড়াই বাঁধে তখন ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আরও রাজনৈতিক বন্দী সেখানে আসিয়া জুটিল। বহু বৎসর পর ভারতের নবীন সহযাত্রীদিগকে পাইয়া তাঁহাদের হৃদয়মরুতে যেন বারিধারা বর্ষিত হইল! পূর্বে যে সকল লোকের নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সেখানে। অনেক লোক হওয়াতে সরকারের ব্যবস্থানুসারেই এক নম্বরে দশ-বার জন করিয়া থাকিত কিন্তু হুকুম যে, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না। আমরা বাক্ সংযমী নহি, বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা একটু অধিক বাকপটু, সুতরাং এ-দণ্ড আমাদের নিকট বড় গুরুদণ্ড বলিয়া মনে হইল। প্রথম প্রথম ব্যাড়ি সাহেব নবীন যাত্রীদিগকে ভয় দেখাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সুফল প্রসব করে নাই। বিশেষতঃ শিখ ও রাজপুতগণ বীরের জাতি; কাহাকেও ভয় করে না। সরকার পক্ষের ভয়ের কারণ ছিল দুইটি, এক দিকে শিখদের প্রতাপ অপর দিকে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবল। শিখদের বীরত্বকে যত ভয় করিত বাঙ্গালীর বুদ্ধিবলকে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিত।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শ্রীযুত পরমানন্দ সৌরিয়া নবীন যাত্রীরূপে আসিয়া কুঠি বন্ধ হইয়া কাজ করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স সতের-আঠার হইবে, তিনি যাহা খুসী তাহাই করিতেন। তাহাকে coir pounding দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কোন দিন ২ পাউণ্ডের পরিবর্তে ২ আঃ, কোন দিন ৪ আঃ তার বাহির করিতেন। এ সংবাদ ব্যাড়ি সাহেবের কানে যায়। এক দিবস সকাল বেলা তাকে অল্প বয়স্ক দেখিয়া সম্পূর্ণ কাজ আদায় করিবার জন্য বড় তিরস্কার করে এবং অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতিদান স্বরূপ তিনি ব্যাড়ি সাহেবের ভূড়িতে এক লাথি মারিয়া ভূতলশায়ী করেন এবং তাহার উপর আরও যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ই জেলের Tindal, জমাদার, ওয়ার্ডার প্রভৃতি পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল; তাঁহাকেও কিছু উত্তম মধ্যম ভোগ করিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মধ্যে আনন্দের কোন অভাব হয় নাই। তাঁহার যেমন নাম, সর্বদাই তাহার মধ্যে সে ভাবের প্রাবল্য দেখা যাইত। তাঁহার যখন ফাঁসির হুকুম হয় তখনও তাঁহার মধ্যে সর্বদা পরমানন্দ ভাব বিরাজ করিত। পরমানন্দের এ বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে তাহাকে বিশ ঘা বেত্রদণ্ড, তিন মাস বেড়ী পাইতে হইল। আর পুনঃ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত কুঠিতে নির্জন বাসের ব্যবস্থা হইল।

এই ঘটনার পর পরমানন্দ তিন দিবস কিছুই আহার বা পান করেন নাই। এক দিবস ব্যাড়ি সাহেব আসিয়া না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার উত্তরে সে বলিল, "ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইবার জন্য উপবাস করিতেছি। ব্যাড়ি সাহেব বলিল, "কি প্রার্থনা"। তাঁহার উত্তরে তিনি বলিল, "ইংরেজ রাজ্যের ধ্বংস কামনা"। তাহার মুখে একথা শুনিয়াই সে প্রস্থান করিল।

রবিবারে কাজ করিবার নিয়ম নাই, জেলে ঐদিন বিশ্রামের দিন। কোন অসৎ উদ্দেশ্যে চত্তর সিং, উদম সিং, পৃথ্বী সিং, পরমানন্দ প্রভৃতি ছয়

জনকে রবিবারে ময়দানের ঘাস ছিড়িবার জন্য আদেশ দেয়। তাঁহারা উহা করিতে অস্বীকার করেন। ইহার ফলে তাঁহাদিগকে ঐদিবসেই court করিয়া প্রত্যেককে ছয় মাস কুঠিবন্ধ, অল্প খানা ও ছয় মাস বেড়ীদণ্ড দেয়। ইংরেজ রাজ্যে কোন স্থানেই রবিবারে court হয় না। কিন্তু রাজবন্দীদিগের বেলায় সবই special! কোন প্রকারে অত্যাচারের দ্বারা জব্দ করাই বোধহয় ইহার উদ্দেশ্য।

শিখরা বীরের জাতি। তাহারা মরণকে ভয় খুব কমই করে। চত্তর সিংকে সেদিন যে বন্ধ করিল, ছয় মাস পার হইয়া যাওয়ার পরও তাঁহাকে মুক্ত করিল না। until further order করিয়া রাখিয়া দিল। এভাবে দিন যাইতে লাগিল, তিনি জেল কর্তৃপক্ষের উপর মৌখিক কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগের বাকী রাখিলেন না। ক্রমে এক বৎসর, দুই বৎসর পার হইয়া গেল। এক দিবস ওজন করিবার সময় তিনি Superintendent-কে আক্রমণ করেন। এখানে মাসে দুই দিবস Superintendent নিজে প্রত্যেক নির্বাসিতকে ওজন করে। এই আক্রমণের ফলে সে স্থানেই তাহাকে অত্যন্ত নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। Superintendent-এর সম্মুখেই প্রহরীগণ নির্দয় ও নির্মম ভাবে তাহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার ফলে তাঁহাকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা জ্ঞানহীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। প্রহারকালে একজন প্রহরীর হস্তস্থিত লগুড় দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায় দুই-তিনটা injection-এর পর তাহার চৈতন্য হয়। ইহারই পর তাঁহার স্বাস্থ্য নানা অসুখে নষ্ট হয় এবং ওজন হ্রাস হইয়া তিনি অতি দুর্বল হইয়া পড়েন। এখানে সরকারেব যে ভাব তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে cell হইতে বাহির করিবে না। তাঁহার জন্য যে cell হইল তাহাও special তেতালার উপর শেষ কুঠির মধ্যে, আবার উহার সম্মুখটা লোহার শিক ও জালদ্বারা আবৃত। ওখানে স্নান, আহার ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। মেথর ব্যতীত অন্য কোন কয়েদীর সেখানে যাইবার উপায় নাই। এ ভাবে চারি বৎসব পার হওয়ার পর jail reform Committee যখন ওখানে যায় তখন তাহার সঙ্গে দেখা করে। ক্রমে দুই দিবস তাহার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তাহাবা তাহাকে cell-এর বাহির করিবার জন্য recommend করে। যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিল তখন সে উপস্থিত ছিল না বলিয়াই সাড়ে চার বৎসর পর ঐ Recommend-এর ফলে তিনি cell হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ভাই ভান সিং নামক আর একজন সহযাত্রী দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এখানে ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বয়সও যে কম ছিল তাহা নহে। তাঁহাকে ৩ পাউণ্ড নারিকেলের তার দিয়া তিন পাউণ্ড দড়ি দিবার কাজ দেয়। তার (coir) দিবার বেলায় যেমন ওজন করিয়া দেয়, আবার নেবার বেলাও তেমনি ওজন করিয়া নেয়। তারগুলি ভাল শুকান না থাকিলে দড়ি প্রস্তুত করার বেলায় শুকাইয়া কম হইয়া যাইবার কথা। মাঝে মাঝে এরূপ হইত বলিয়া তাহার task ticket-এ ক্রমে কয় দিবস short task লিখা হয়। ইহা নিয়া তাহার সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসা হয়। ভাই ভান সিং-এর কথা, "ঠিক ৩ পাউণ্ড তার দিয়া ৩ পাউণ্ড রসি হইতে পারে না", তাঁহার মুখখানা বড় চোস্ত। এরূপ হবার যথেষ্ট কারণও আছে। পূর্বে এখানে গোরা সিপাহী পাহারা ছিল না। এই সকল আয়োজন আমাদের জন্যই। যেখানেই যাই সেখানেই বাবুর ন্যায় এই গোরা সিপাহী আমাদিগকে সর্বদা গ্রাস করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। এই গোরা সিপাহীদের মধ্যে একটা লোক বেশী মাত্রায় অসভ্য ছিল। একদিন সে ভাই ভান সিংকে দড়ি মোটা হইয়াছে বলিয়া গালি এবং তাহার হস্তাস্থিত যষ্ঠি দ্বারা একটা গুঁতা দেয়। তিনিও তাহার পরিবর্তে যথেষ্ট গালি দেন। তাঁহার অভিযোগ ছিল যে তাঁহাকে অন্যায় ভাবে সাজা দিয়াছে।

এই কারণে তাঁহাকে প্রথম standing handcuff পরে তিন মাস কুঠি বন্ধ করে। এই দণ্ড দেওয়ার পর তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন, পরে তাঁহাকে আবার ছয় মাসের জন্য barfetters, কুঠি বন্ধ, কম খানা দণ্ড দেয়। ইহার পরেও তিনি কাজ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহার উত্তর ছিল, "যতদিন দণ্ড ভোগ করিব ততদিন কাজ করিব না। আমাকে কুঠির বাহির ও অন্যান্য দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিলে কাজ করিব।" তখন supdt Major Mary। সুতরাং কোন মীমাংসা তাহা দ্বারা সম্ভবপর নহে। তাঁহাকে আবার "until further order" বেড়ী, কুঠি বন্ধ, "কম খানা" দণ্ড দেয়। ইহার পর ভাই ভান সিং একেবারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। কর্তৃপক্ষের যে কোন লোককে দেখিলে অবিশ্রান্ত গালি দিতেন।

এই সমস্ত অন্যায় দণ্ডাদেশের প্রতিকারের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল নিজের প্রতি অবিচারের প্রতিকার নহে, ভবিষ্যতে আর কাহাকেও যাহাতে অন্যায় ভাবে দণ্ড দিতে সাহস না হয়

সে জন্যই তিনি এই নির্যাতনকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিবাদ হিসাবে, supdt. বা jailor যখন তাঁহার নিকট আসিত তখন তিনি দাঁড়াইতেন না, সময় সময় পেছন ফিরিয়া থাকিতেন। এ অপরাধের জন্য জেলার প্রথম তাঁহাকে গালি দিত, তিনি তাহার পরিবর্তে গালি দিতেন। ইহার পর jailor যখন তাহার নিকট যাইত তখন পাঁচ-ছয় জন প্রহরী বলপূর্বক তাহাকে হাতকড়ী দ্বারা দাঁড় করাইয়া রাখিত। তখন তিনি বলপ্রয়োগ করিতেন বলিয়া প্রহরীগণ তাঁহাকে প্রহার করিতেও ক্রটি করিত না। ইহার পর parade day ব্যতীত আর কেহ তাহার নিকট আসিত না। সয়তানের সয়তানি দেখাইবার জন্য এক দিবস ব্যাড়ি সাহেব বেলা ১০টার সময় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ভান সিং! ক্যায়সা হ্যায়? একথা শুনা মাত্রই ভান সিং জমাটবাধা ক্রোধের ঝাল মিটাইলেন। ইহার পর ব্যাড়ি সাহেব তাহাকে চত্তর সিংহের জন্য যে cell নির্মিত হইয়াছিল সেই cell-এ নিয়া যাইতে হুকুম দিল। চত্তর সিংহের জন্য তিনটি cell নির্মিত হইয়াছিল ১, ২, ৪ ও ৭ নম্বরে। ভাই ভান সিং তখন ২ নম্বরেই ছিলেন। তাঁহাকে special cell-এ নিয়া যাবার জন্য হাওলদার, গোরা পাহারা, টিণ্ডেল, জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। ১০টার পর আমরা রাজবন্দী প্রায় আট শত দশ জন বাহির হইয়াছি। তাঁহাকে যখন স্থানান্তরিত করিতে আসে তখন তিনি কুঠি হইতে বাহির হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে রীতিমত দ্বন্দ্ব চলে। তিনি একা সুতরাং বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। মানুষের উপর এমন নির্মম অত্যাচার কখনও দেখি নাই। ইতিমধ্যে ব্যাড়ি সাহেব আসিয়া পড়িয়াছিল, আমরা যে কয়জন রাজবন্দী ছিলাম সকলেই দৌড়াইয়া উপরে গেলাম, কিন্তু বারান্দার প্রধান ফটক বন্ধ ছিল কাজেই আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না। আমাদের সকলকেই attempt of mutiny-র অপরাধে দায়ী করিয়া কুঠি বন্ধ করিল, (আমি, ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, গোপাল বরি, হরদেত সিং, পরমানন্দ, লাল সিং, হাজাড়া) মারে সাহেব বড় চালাক, সে সর্বদাই বাঙ্গালী-পাঞ্জাবীকে কোন কাজেই এক হইতে দিত না। এ জন্যই বাঙ্গালী তিন জনকে ছাড়িয়া দিয়া বাকী কয়জনকে ছয় মাসের জন্য বেড়ী ও কুঠি বন্ধ করিয়া দিল। ব্যাড়ি সাহেবের ইহাতেও ঝাল মিটিল না, আবার একদিন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টায় যাইয়া তাহাকে নানা কথায়

উত্তেজিত করিতে লাগিল। ভাই ভান সিংও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি মৌখিক ও কায়িক যত প্রকার অস্ত্র ছিল, কোনটাই প্রয়োগ করার ত্রুটি করেন নাই। এমন সময় ব্যাড়ি সাহেব তাহার পারিষদদিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। তখন আমাদের কেহই এই নম্বরে ছিলাম না। ভবিষ্যতে এমন করিবে বলিয়াই বোধহয় সকলকে অন্যান্য নম্বরে বদলি করিয়া দিয়াছিল। সে দিবস তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। দুই দিন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। যদিও তাঁহাকে হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অত্যধিক প্রহারের ফলে তাঁহার শরীরের বহু স্থান ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল! পরে আমাশয় দেখা দিল। দিনের পর দিন তাঁহার দুঃখে-কষ্টে কাটিতে লাগিল। কেহ যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে তাহারও উপায় নাই। অসুখ হইলেও তখন আমাদের স্থান হাসপাতালে নাই। ভাই ভান সিংকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন বৃদ্ধ সোহং সিংহ হাসপাতালেই ছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে আসিলেও তাহার সঙ্গে দেখা করার উপায় ছিল না। যাহাতে দেখা না করিতে পারেন তাহার জন্য special পাহারা নিযুক্ত করা হইল। দরকার যতই বেশী হয় ততই আমাদের বুদ্ধিও খোলে, সুতরাং কোন উপায়ে তাহার সঙ্গে যে দিন হাসপাতালে আনা হয় সেই দিনই সোহং সিং আলাপ করিতে সমর্থ হইলেন। দেখা করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কথা বলিবেন কাহার সঙ্গে! তাঁহার তখন কথা বলিবার শক্তি নাই! তাঁহার মুখদিয়া রক্ত বমন হইতেছে, মলের সঙ্গে রক্ত দেখা দিতেছে। কম্পাউণ্ডার তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইল তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। এই মর্মান্তিক দৃশ্য ভাই সোহং সিং স্বীয় চক্ষে দেখিয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রোগ মুক্ত না হইয়াই ফিরিয়া আসেন এবং সকলের নিকট উহা বর্ণনা করেন। কিছুদিন পর একটু সুস্থ হইয়া ভাই ভান সিং শেষ দেখা করিবার জন্য সকলের নিকট সংবাদ দেন। যে কোন উপায়েই হউক ভাই সের সিং হাসপাতালে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার শেষ কথা শুনিয়া আসেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সকলের নিকট সকল নম্বরে হৃদয় বিদারক সংবাদ দেন। এ সংবাদে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং এক বৃহৎ ধর্মঘট (general strike) সৃষ্টি হয়। এই ধর্মঘট হইবার পূর্বে সকলেই ইহার বিচারের জন্য supdt.-কে জানায় কিন্তু কাহারও কোন

কথায় supdt. কর্ণপাত করিল না বলিয়া সকলে আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটের মধ্যে বাদ পড়িল তাহারাই—পুরাতন দল, অসুস্থ ও অনিচ্ছুক যাহারা। একদিন হঠাৎ ১১টার সময় যখন ধর্মঘটের সংবাদ পৌঁছিল তখন পুনরায় ব্যাড়ি সাহেব ও supdt Major Marry আসিয়া নাম মাত্র সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ছয় মাস বেড়ী, কুঠি বন্ধ* ও কয় মাস দণ্ড দিয়া চলিয়া গেল। এবারে জেলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ব্যাড়ি সাহেবও একটু নরম হইল। যাহারা ধর্মঘট করিয়াছিল তাহাদের টিকিটে অপরাধ লিখিল conspired with others to refuse work তাহাদের পোষাক হইল 'C' মার্কা আর আহারের সময় হইল ভিন্ন। যখন তাহারা স্নান ও আহার করিতে বাহির হইত তখন জেলের সমস্ত কয়েদী তালা বন্ধ থাকিত। এরূপে দুঃখের দিন চলিতেছে; এদিকে ভাই ভান সিং তাহার মধ্যেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। ইহার পূর্বে chief commissioner আসিয়া সকলের সঙ্গে দেখা করে। কেহবা সম্পূর্ণ ঘটনা জানাইতে চেষ্টা করিয়াছে আবার কেহবা কোন কথাই বলে নাই। তখন C.C ছিল Mr Dugglas এও মারে সাহেবের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এদের আসা-যাওয়াটা একটা নিয়ম রক্ষা। ভবিষ্যতে কোন কথা উঠিলে যেন সাফাই সাক্ষ্য দিবার মত একটা রিপোর্ট থাকে।

ভাই ভান সিং আজ এ-জগতে নাই কিন্তু যে অসীম তেজস্বিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি কোন বিষয়েই জেল কর্তৃপক্ষের নিকট মাথা নত করেন নাই। মৃত্যুকেও বরণ করিয়া তিনি তাঁহার আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নিজের মতে নিজে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। তাঁহার দণ্ড মাত্র দশ বৎসর ছিল। চেষ্টা করিলে তিনি অনায়াসে এই দশ বৎসরকাল কাটাইয়া বাহিরে আসিতে পারিতেন, কিন্তু পরাধীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই বোধহয় তাঁহার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয় ছিল বলিয়া তিনি আজ মরণকে বরণ করিয়া অমর হইয়াছেন।

General strike যখন হয় তখন চুয়াল্লিশ জন বন্দী তাহাতে যোগ দেয়। ইহার পঁচিশ দিবস পর chief commissioner কারণ অনুসন্ধান

* কুঠি বন্ধ অর্থ separate confinement

করিতে আসে। তাহার উদ্দেশ্য, সাধারণতঃ সরকারী পক্ষে যাহা থাকে, ঘটনাটি কোন প্রকারে ধামাচাপা দেওয়া। যাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছে তাহাদের সকলেই বলিয়াছে এবং কারণ দেখাইয়াছে যে বৃথা ভাই ভান সিংকে মারা হইয়াছে। তাহাদের উত্তরে প্রত্যেককেই বলিয়াছে যে তাহাকে প্রহার করা হয় নাই, উল্টা তাহাদিগকেই অপরাধী বলিয়া মনে করিয়াছে। শ্রীযুত ত্রৈলোক্যবাবু যখন অভিযোগ জানান তখন তাহার উত্তরে তাঁহাকে বলে যে সে তোমার চাচা না ভাতিজা, তার জন্য তুমি কেন বলিতে আস। তাহাকে মারা হয় নাই, সে একটা বদমাইস, সে তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। তখন ত্রৈলোক্যবাবুর হাঁপানীর আক্রমণ প্রবল ছিল। তিনি বলিলেন, আমার asthma থাকা সত্ত্বেও আমাকে হাসপাতালে রাখা হয় নাই কেন? তিনি তাঁহার টিকেট হইতে দেখাইলেন যে ৩০ তারিখে তাহার অসুখ এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিন-চার জন লোক তাঁহাকে হাসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন তাঁহাকে detain করে পর দিবস হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু পর দিবস supdt মারে সাহেব আসিয়া ডাক্তারকে ধমকাইয়া বলিল, একে কেন ভর্তি করা হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ৩১শে তারিখ তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাকে ভর্তি করে। C.C-কে যখন এ অবস্থা বলিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কথাটি বিশ্বাস করিতে পার যে ৩১শে তারিখ আমি সম্পূর্ণ নিরোগ ছিলাম।" তখন মারে সাহেবকে নিরুত্তর দেখিয়া "এ সকল তোমার বাহানা।" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

প্রয়াগপুর ডাকাতি মোকদ্দমার শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ড পাইয়া আন্দামানে আসেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ। এখানে আসা মাত্রই তাঁহাকে কঠিন কাজে দেওয়া হয়। সে কাজ ছয় মাস পর্যন্ত নির্বিবাদে করিয়া কাজ পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্য Major Murray-কে জানান। মেজর তাঁহার কথাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে এই কাজেই রাখে। তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করায় আশুবাবু কাজ করিতে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করায় তাঁহাকে cross bar fetters with standing hand cuffs 10 and 7 days respectively দেয়। এই দণ্ড শেষ হওয়ার পরও ক্রমান্বয়ে আশুবাবু কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া চলিলেন আর সরকার পক্ষও পর পর দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া

যাইতে লাগিল। সকল প্রকার জেল দণ্ড দিয়া শেষে warned for flogging টিকিটে লিখিয়া দিল। ইহার পরেও আশুবাবু কাজ করিলেন না বলিয়া শেষে তাঁহাকে দণ্ড বাড়াইয়া দিবে এ ভয় দেখায়, তাহাতেও কাজ করিতে রাজি হইলেন না। পরে দণ্ড বাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে আমরা সকলেই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে বাধ্য করি। পূর্বে কাজ ছিল দৈনিক ২ পাউণ্ড ছিলকা। এবার কমাইয়া তাঁহাকে দৈনিক ১ পাউণ্ড করিয়া দিল আর বলিল, এক মাস কাজ করিলেই বদলাইয়া দিবে। তাঁহাকে শেষ কালে পনের ঘা বেত্রাঘাতও পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে জেলের কোন দণ্ডই বাকী ছিল না। সকলই ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি যখন ধরা পড়েন তখন এম.এ ক্লাসে পড়িতে ছিলেন। জীবনে তিনি কোন শক্ত কাজ করেন নাই। এ অবস্থাতে একটি অল্প বয়স্ক যুবককে প্রথম যে কঠিন কাজ দিয়াছিল তাহা অত্যন্ত অবিচার বলিতে হইবে। তাহা হইলেও ইনি ছয় মাস সে কাজ নির্বিবাদে করিয়াছিলেন। এরূপভাবে নির্যাতনকে ইচ্ছা করিয়াই নির্যাতন করা বলিতে হইবে।

আমাদের এক মোকদ্দমায় ত্রৈলোক্যবাবুকে অসুস্থাবস্থায় আন্দামানে পাঠান হয় তাহা পাঠকগণ জানেন। ইনি হাঁপানি রোগের আক্রমণে প্রায় একরূপ অচল ছিলেন তথাপি তাহাকে Coir Pounding দেয়। রুগ্নাবস্থায় তাঁহার পক্ষে একাজ করা বড় কঠিন। তথাপি তিনি কোন প্রকারে কাজ করিতেছিলেন। শচীন্দ্র নাথ সান্যালকে ঘানিতে দেওয়া হয় এ সংবাদও পাঠকগণ রাখেন। সান্ন্যাল কাজে অক্ষম হইয়া strike করেন সে সঙ্গে ত্রৈলোক্যবাবুও তাঁহার সঙ্গে strike করিয়া সহানুভূতি দেখান। সে সময় তাঁহাকে cross barfetters for 10 days ও standing handcuffs for 7 days দণ্ড দেয়। এ-সময়েই তাঁহার উপর সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে। তাহার পর martial law অর্থাৎ আমেদাবাদ ও জালিয়ানওয়ালা বাগ মামলার নির্বাসিতদের কতক জনকে ঘানিতে দিয়া অত্যাচার করার প্রতিবাদ করে। martial law prisoner দিগকে ঘানিতে দেওয়া হইলে পর তাহারা সকলেই ঘানি ঘুরাইতে অস্বীকার করে। তাহারা ছিল সত্যাগ্রহী; তাহাদিগকে ঘানি ঘুরাইতে দেওয়া হইলে পর তাহারা তাহাদের আদর্শনীতি অবলম্বন করিল। তাহাদের এক জনকে ঘানিতে বাঁধিয়া ঘুরাইতে হুকুম দিল। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই মেসিন চলিতে লাগিল। সে যখন শুইয়া পড়িল তখনও বৃত্তাকারে ঘুরাইতে ত্রুটি করিল না। ইহাতে

তাহার পিঠের এক প্রচণ্ড চর্ম উঠিয়া গেল। এই প্রকারে অর্ধমৃত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই সংবাদ যখন রাজবন্দীদের কাহারও কাহারও কানে পৌঁছিল তখন তাহারা জেলারকে ডাকাইয়া মৌখিক প্রতিবাদ করিলেন। অপর দিবস আবার যখন পূর্ব দিবসের ন্যায় ব্যবহার করিতে টিণ্ডেল, জমাদারগণ প্রস্তুত হইল তখন সেই নম্বরের রাজনৈতিক বন্দীরা হৈ চৈ করিতে লাগিল, ইহার ফলে আর তাহাদিগকে কুলুতে বাঁধিয়া অত্যাচাব করে নাই। কিন্তু যাহারা হৈ চৈ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই cell বন্ধ করিয়া দিল। পূর্ব হইতেই কোন প্রতিবাদের অপরাধে ত্রৈলোক্য বাবুকে একবার চার দিবস penal diet দণ্ড পাইতে হয়। এবং নাধান সিংকে তিন মাস কুঠিবন্ধ (নির্জনবাস) করে ও এরূপ ভাবে একটার পর একটা করিয়া প্রায় তিন বৎসবই তাঁহাকে নানারূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে দেড় পাউণ্ড ছিলকার কাজ দেয়। ত্রৈলোক্যবাবুর ডাণ্ডা-বেড়ি ও separate confinement (নির্জনবাস) দণ্ড ছিল। তাহার সহিত ভূপেন্দ্র ঘোষ, নাধান সিং, করমচাঁদ ও আরও দুই-তিন জনকে বন্ধ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। সেই দিন supdt-এর Inspection day ছিল। supdt যখন আসিল তখন তিনি তাহাকে পূর্ব বর্ণিত অত্যাচারের ঘটনাগুলি বলিলে তাহার উত্তরে তাঁহাকে বলিল, "who is the superintendent of the jail, you or I" তদুত্তরে ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, "তুমি supdt বলিয়াই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এইরূপ অন্যায় ভাবে তাহাদের উপর কেন অত্যাচার করিলে।" তাহার উত্তরে supdt বলিল, "তাহার কি, তুমি বদমাইস ; বদমাইসি করিয়া জেলের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছ।" ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন "সাবধান হইয়া কথা বল"। supdt Major Barker বলিল, "চুপরাও কুত্তাকা বাচ্চা"। ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, "শালা শুয়াবকা বাচ্চা, তোম চুপরাও"। ইহার পর নাধান সিং-এর সহিত খাবার পরও বচসা হয়। general strike-এর পর অসুস্থ শরীরে ১ পাউণ্ডের বেশী কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়া ত্রৈলোক্য বাবুকে আবার তিন-চার বার নানারূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আন্দামানের অধিকাংশ সময়টাই তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে কাটাইতে হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে শিবপুর মামলার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষও বহুবার নানা প্রতিবাদের ফলে অনেক নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিখ ও বাঙ্গালীদের মধ্যে আবও কেহ কেহ যে নির্যাতন অর্থাৎ জেল দণ্ড ভোগ

না করিয়াছে তাহা নহে। তবে যাহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁহাদেরই নাম নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

পৃথ্বী সিং, কালা সিং, বিষন সিং, প্যায়ারা সিং, অমৃতলাল হাজরা, ভাই সোহং সিং, ছোট পরমানন্দ, অমর সিং, জোয়ালা সিং, জীবন সিং, নন্দ সিং, উদাম সিং, যতীন্দ্রনাথ নন্দী, যতীশ পাল, লাল সিং, বিশাখা সিং ইত্যাদি।

পুরাতনদের মধ্যে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম নির্যাতন ভোগের কারণে জেলে অতি প্রসিদ্ধ। জেলের সমস্ত কয়েদী আজও তাহার নাম ভুলিতে পারে নাই। ননীগোপাল যখন ওখানে ছিল তখন পর্যন্ত আমরা এখানে আসি নাই, সুতরাং স্বচক্ষে দেখিতে পারি নাই, তবে সাধারণ নির্বাসিতদের মুখে শুনিয়াছি "ননীগোপাল মানুষ নহে দেবতা"। অত্যাচারী জমাদার মিরজা খাঁর অত্যাচারে যখন কখনও বিচলিত হয় নাই, তখন এই কালা পাহাড়ের মুখেই লোকে একথা শুনিতে পাইয়াছে। পরে এই পাঠান মিরজা খাঁর এই বিশ্বাস সত্য সত্যই হইয়াছিল যে ননীগোপাল বাস্তবিক দেবতার অংশ। ননীগোপাল সাড়ে চার মাস অনাহারে ছিল, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহার পর্যন্ত করে নাই। অর্থাৎ সে জেলের কোন নিয়মেরই অধীন ছিল না।

শ্রীযুত গণেশ দামোদর সাভারকর পুরান দলের মধ্যে সর্ব বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন, আমরা শেষ পর্যন্তও দেখিয়াছি সরকারী নিয়মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইনিও ব্যাড়ীর দৃষ্টিতে পড়িয়া বহুবার নানা প্রকারের দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। আমরা চিরদিনই দেখিয়াছি ব্যাড়ী সাহেব তাঁহাকে একটু ভয় করিয়া চলিয়াছে।

প্রায়োপবেশন

ননীগোপালের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত যখন ৺ভান সিং-এর জন্য বড় ধর্মঘট হয়, তখন সর্বাগ্রে পৃথ্বী সিং ও ভাই সোহং সিং আহার পরিত্যাগ করেন। ভাই ভান সিং-এর উপর যে নির্মম অত্যাচার হইয়াছে ইহার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাহারা আহার করিবে না ইহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। ছয় দিন পর্যন্ত তাহারা কিছুই আহার করে নাই। ষষ্ঠ দিবসে বৃদ্ধ সোহং সিং অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাঁহাকে উঠাইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, পরে force feeding করাতে তাঁহার সংজ্ঞা আসে। ইহার দুই দিবস পর পৃথ্বী সিং-কে হাসপাতালে নিয়া যায়। পৃথ্বী সিং সাড়ে চার মাস অনাহারে থাকে আর সোহং সিং আমাদের সকলের অনুরোধে আড়াই মাস পর খাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, আর পৃথ্বী সিং-এর বয়স পঁয়ত্রিশের অধিক হইবে না। এই সঙ্গে জীবন সিং-ও প্রায়োপবেশন আরম্ভ করে। এই জীবন সিং চোদ্দ দিবস জল পর্যন্ত পান না করিয়া চলিতে পারিত। এই প্রায়োপবেশনের দরুণ পৃথ্বী সিং-এর স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া যায়, সোহং সিং-এর স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং জীবন সিং-এর অজীর্ণ রোগ দেখা দেয়। এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম ষড়যন্ত্র মামলায় নির্বাসিত পণ্ডিত রামরক্ষা প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহাদের মধ্যে অমর সিং ধর্মঘটে যোগ দেয়।

পণ্ডিত রামরক্ষা জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি যখন এখানে আসেন তাঁহার যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লয়। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানান যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; যজ্ঞোপবীত ব্যতীত জল গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিতে হয়। প্রায় দুই মাস প্রায়োপবেশনের পর তাঁহার উদরে একটা বেদনা দেখা দেয়। অনেক সময় বেদনায় চীৎকার করিতেন কিন্তু

তাহার কোন চিকিৎসা হইত না। রাত্রিকালে যন্ত্রণায় যখন চীৎকার করিতেন তখন warder চীৎকার বন্ধ করার অভিপ্রায়ে তাঁহার উপর জল ঢালিয়া দিত।

কিছু দিন এ-ভাবে থাকার পর তাঁহার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই ধর্মঘটের সময় বালেশ্বর যুদ্ধ মামলার একমাত্র জীবিত আসামী জ্যোতিষচন্দ্র পাল ·াকলের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রায় দুই মাস পর সে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করে। ভান সিং-এর মৃত্যুতে সকলেরই মনে এক অন্তর্দাহ মর্মপীড়া ছিল, তাহার উপর আবার তাঁহার সঙ্গে জেল সরকারের একটা ঝগড়া হইয়া যায়। যখন ধর্মঘট চলে তখন শীতকাল। শীত যদিও ওখানে বেশী নহে তথাপি খালিগায়ে থাকা যায় না। কয়েদীর শীতের সম্বল একমাত্র কম্বল ও কম্বলকোট। এখানে যাহাদের উপর নির্জন বাসের আদেশ হয় তাহারা কুঠির ভিতর একটি জাঙ্গিয়া ও একটি জামা ছাড়া আর কিছুই রাখিতে পারে না। একে শীতকাল এবং শরীর দুর্বল বলিয়া জ্যোতিষবাবু কম্বলকোট গায়ে দিয়া কুঠির ভিতরে নিয়া যাইতেন, তিনি যে এ-আরাম ভোগ করেন তাহা সরকারের চোখে সহ্য হইল না। এক দিবস কুঠির মধ্য হইতে তাহাকে কম্বলকোট বাহির করিয়া দিতে বলা হয়। তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় জমাদার ও হাওলদার বলপূর্বক তাহা বাহির করিতে চায়। সে সময় ধস্তাধস্তি হয়, পরে দেহ হইতে খুলিয়া লইতে অক্ষম হইয়া কম্বলকোটটাকে ছিঁড়িয়া টুকরো করিয়া বাহির করিয়া লয়। ইহার পরই সে নির্জনতার মধ্যে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করে। কিছুদিন এভাবে চলার পর তাহার মানসিক অবস্থার বিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এ-সংবাদ supdt-কে দেওয়া হইল কিন্তু কিছুই করিল না। একদিন রাত্রিকালে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, তখনও জেল সরকারদের ধারণা যে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিতেছে। কখনও ভাল কখনও মন্দ এভাবে চলিতেছে ক্রমে যখন তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে তখন তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যায়। হাসপাতালে নিয়া তাহাকে সেই নির্জন স্থানেই রাখে তখন একেবারে জ্ঞানশূন্য উন্মাদ হইয়া পড়ে। তাহার আর প্রতিকারের কোন উপায় রহিল না। প্রায় এক মাস সাত দিন পর তাহাকে জেলের বাহিরে Haddo district-এ পাগলা গারদে পাঠায়। সেখানে নিবার পর তাহার অবস্থা আরও অধিক খারাপ হয়।

পরে জানিতে পারিলাম যে এখানে ভাল লোক থাকিলেও উন্মাদ হইতে পারে। উন্মাদকে অধিক উন্মাদ করার উদ্দেশ্যেই বোধহয় এ স্থানের সৃষ্টি।

এখানে আসিয়া যখন তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইল তখন দায় এড়াইবার জন্য তাঁহাকে বহরমপুর পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর তাঁহার অবস্থা যে কি, বাঁচিয়া আছে কিনা কিছুই জানিতে পারি নাই। এখন তাঁহার সংবাদ কিছু কিছু জানিতে পারি। আর তাঁহার মাতা যখন government-এর নিকট দরখাস্ত করেন সে সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া ১৯২১ কি ১৯২২ সালে তাঁহার কতক অবস্থা জানিতে পারিলাম।

আমরা প্রথম দিবস জেলে প্রবেশ করার পরই দৌড়াইয়া আসিয়া যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদের সঙ্গে কি political prisoner আসিতেছে" তিনিই এই জ্যোতিষ চন্দ্র পাল। আমাদিগকে এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করিয়া দ্রুত পলায়ন করায় কারণ তিনি সেই দিবস আমাদিগকে জানাইয়া ছিলেন, "এখানে কোন দুই জন রাজনৈতিক নির্বাসিতের আলাপ করার হুকুম নাই, আর আপনারা নূতন আসিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদিগকে কোন অবস্থায়ই মিশিতে দিবে না। মিশামিশি কারো দৃষ্টিতে পড়িলেই দণ্ড দিয়া সেই নম্বর হইতে অন্য নম্বরে পাঠাইয়া দেয়। আপনারা দেশ হইতে আসিয়াছেন, আপনাদের নিকট দেশের অনেক নূতন সংবাদ জানিবার আশা আছে সেই জন্যই দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছি।" ইনি এখানে অনেক কার্যেই সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। নানা সময়ে নানা কারণে তাহাকে অনেক নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা নির্বিবাদে সহ্য করিয়া সৎসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আবার বহু বৎসর পর সংবাদ পাই ১৯২৫ সালের ৮ই জানুয়ারী, দেশভক্ত "মৃত্যুর পর আমার আত্মা পরলোক থাকিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না, আমার দেশপ্রেম যদি আন্তরিক হয় তাহা হইলে আমার মাতৃভূমিকে সেবা করিবার জন্য আমি আবার এই পৃথিবীতে আসিব, ইহা নিশ্চয়" এই বলিয়া কারাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া* তিনি অনন্ত মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই ধর্মঘটের সময়ে ভাই নন্দ সিং-এর শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। জেলে

---

* পরে জানিতে পারিয়াছি তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্বে সুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা সময় সময় ভাল থাকিত।

আসার পরই তাঁহার ওজন প্রায় ৪০ পাউণ্ড কমিয়া যায়। এই নির্জন বাসের কালে তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে পরে তাঁহার Tuberculosis দেখা দেয়। ইহার অল্পদিন পরেই জেলে পড়িয়া তাঁহার ৪০ পাউণ্ড ওজন কমে। পরে separate confinement with bar-fetters and invalid diet four months দণ্ডের ফলেই তাঁহার মৃত্যু। ইনি military-তে কাজ করিতেন। ইনি যে regiment-এর লোক উহা Indian force-দের মধ্যে শক্তি ও উচ্চতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি লম্বায় প্রায় সাত ফুট। জেলের invalid diet-ই তাঁহার শক্তি হ্রাস ও Tuberculosis মৃত্যুর কারণ।

রাজনৈতিক নির্বাসিতগণ কর্তৃক জেলের পরিবর্তন (Reform)

রাজনৈতিক বন্দীদের এখানে আসিবার পর হইতে শেষ পর্যন্ত জেলের নির্যাতনের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বার বার অনেক সংগ্রামের পর, অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর, অনেক ঝড়-বায়ু তাহাদের উপর প্রবলবেগে বহিয়া যাইবার পর সরকার পক্ষকে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইয়াছিল যে বোমাওয়ালারা নির্যাতনে দমিবার পাত্র নহে, তাহারা অত্যাচারকে চোখের সামনে দেখিয়া বিনা প্রতিবাদে সহ্য করার পাত্র নহে। তাহাদের এই চরিত্রবলের প্রভাবের নিকট জেল-কর্তৃপক্ষের গর্ব শেষকালে খর্ব হইয়াছিল তাহারই প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি কথা পাঠকগণকে জানাইবার ইচ্ছায় এই অধ্যায়ের অবতারণা। এ সকল খণ্ড যুদ্ধ পাঠ করিয়া, পাঠকগণ তৃপ্তি পাইবেন কি না জানি না। যাহারা দেশ ছাড়া, চির জীবনের জন্য দেশের মাটি হইতে নির্বাসিত, যাহারা আপন পরিজনের স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত, এখানে যাহাদের আপনার বলিতে কেহই নাই, তাহাদের উপর কিরূপ নির্মম অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় তাহা দেশবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তাহাই দেশবাসীকে জানাইবার অভিপ্রায়ে দুই-চারটি সংবাদ দিতেছি।

॥ ১ ॥

স্থায়ী পরিবর্তিত নিয়ম

ভোজনের পর ভুক্তাবশিষ্ট ভূমি হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার করা ঝাড়ুদার বা মেথরের কাজ। আমাদের সঙ্গে একটা গোলমাল বাধাইবার উদ্দেশ্যে টিণ্ডেল ও পেটি-অফিসার উপরওয়ালাদের প্ররোচনায় সেই পরিত্যাজ্য অবশিষ্ট আমাদের দ্বারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিত। অন্যান্য সাধারণ বন্দীরা ভয়ে উঠাইয়া লইত, আমরা তাহা করিতাম না। এ কারণে তাহাদের সঙ্গে বাক্যের খোঁচাখুঁচি খুব চলিত। এ সকল ঝগড়া লইয়া ব্যাড়ী সাহেবের নিকট গেলে সামনে কোন একটা মীমাংসা করিত না তাহার অর্থ এই যে কাঁটা দ্বারা কাঁটা উঠাইবার চেষ্টা করা এবং

গোলমালটাকে পাকা করিয়া তোলা। অনেক ঝগড়ার পর যখন আমরাই জয়ী হইলাম তখন convict officer-রা জব্দ হইয়া আমাদের শত্রু হইয়া উঠিল এবং ব্যাড়ী সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হইল। আমরা জয়ী হইলেও আমাদের পিছন হইতে কেউ একেবারে লোপ পাইল না। আমরাও উল্টা সাধারণ বন্দীদিগকেও বাধ্য করিলাম তাহারা যেন ভয়ে ঝুঁটা (ভুক্তাবশিষ্ট) না উঠায়। এরূপ ঝগড়া প্রায় ১৯১৯ সাল পর্যন্ত চলে ইহার পর প্রতিনিয়ত পরাস্ত হইতে হইতে উহা একটা স্থায়ী পরিবর্তিত নিয়মে পরিণত হয়।

॥ ২ ॥

কলু

(আন্দামানের ভাষায় ঘানি)

যাহারা লেখাপড়া করিয়া জীবনের সকল সময় কাটায়, যাহাদের ব্যবসা কুলিমজুরী নহে, যাহারা সামাজিক প্রথার দোষে শ্রমজীবীদের সঙ্গে সমভাবে কখনও চলিবার সুযোগ পায় নাই, যাহারা কঠিন শ্রম করিতে অনভ্যস্ত, অন্য সহজ কাজ থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে কঠিন কাজে দিলে কিরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা না করার উদ্দেশ্য নির্যাতন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। রাজনৈতিক বন্দীদিগের মধ্যে অনেককেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই সকল কাজের মধ্যে জেলে তৈলের ঘানি টানাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। জেলে আসিলে সকলেরই অবস্থা এক, ভদ্র-অভদ্র নাই, দুর্বল-সবল নাই, পারগ-অপারগ নাই, গুণী-নির্গুন বিচার নাই, ছোট বড় সকলেরই প্রতি একরূপ দৃষ্টি, একরূপ ব্যবহার। সরকারের এই সমদৃষ্টির ইতিহাস একমাত্র জেলের ভিতরেই কিন্তু দেখা যায় বাহিরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাহিরে কালা-সাদার অমিল যথেষ্ট আছে। ইংরাজ কর্মচারীরা আমাদিগকে নেটিভ বলিয়া যে ঘৃণা করে এবং এই ঘৃণার ফলে যে আমাদের প্লীহা ফাটে তাহার খবর আমরা সর্বদাই পাই। জেলের বিচারের ন্যায় সরকার যদি সকলকে নিজেদের সঙ্গে মিলাইয়া বাহিরে এক নজরে দেখিত, সকলকেই যদি এক মনে করিত তবে আমাদের এখানে আসিয়া পচিতে হইত না আমাদের সমাজ, ধর্ম ও দেশের উপর অত অত্যাচার হইত না।

যে সকল দুর্বল ও অক্ষম লোককে ঘানিতে দেওয়া হয় তাহাদের উপর প্রত্যহ অনেক অত্যাচার হয়। তাহা কোন রাজনৈতিক নির্বাসিতের চোখে পড়িলেই প্রতিবাদ করে, এই প্রতিবাদের ফলে নির্যাতনকারীদের কাজে বাধা দেওয়া হয় বলিয়া সরকারের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অনেক খবর পৌঁছায়। আমরা বন্দী হইয়া সরকারের ইচ্ছানুরূপ কার্যে বাধা দেওয়াতে তাহাদের সহ্য হইল না। তাহারই ঝাল মিটাইবার জন্য আমাদিগকে নানা উপায়ে জব্দ করিবার চেষ্টা করে। তাহা যে শুধু এই ক্ষেত্রেই করে তাহা নহে, আমরা যতবার যত বিষয়ে জেলের নির্যাতন কমাইয়া পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছি ততবারই আমাদের উল্‌টা বিনা কারণে নির্যাতিত হইতে হইয়াছে। আন্দামানের সমস্ত সময়টাই রাজনৈতিক বন্দীদের এ ভাবে কাটিয়াছে। আমরা যখন কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করি না তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। পাঠকগণ জানেন যে ৬নং কলুর আড্ডায় কখনও কোন রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হইত না। তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞাতসারে সেখানে অত্যাচার করার সুবিধা হইত। তথাপি তাহা আমাদের চক্ষু-কর্ণের গণ্ডী এড়াইয়া যাইতে পারিত না। আমরা এক-একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া Chief Commissioner ও supdt-কে জানাইতে লাগিলাম। গভর্ণমেণ্টের একটা ধারা আছে যে তাহার সাধারণ একটা কর্মচারী, এমন কি একটা পনের টাকা বেতনের আরদালিও যদি একটা অন্যায় করে এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় তবে তাহার সর্ব উপরিতন কর্মচারী হইতে নিম্নের সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করে না। উপরিতন কর্মচারীদের নিকট অভিযোগ আনিতেও ফল যাহা সর্বত্র হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইতে চলিল। কিন্তু আমরাও একেবারে নাছোড় বান্দা হইয়া লাগিলাম—বহু বৎসর এভাবে চলিতে লাগিল। একটা শেষ সীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হইবে না বলিয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্কল্প করিল। অবিশ্রান্ত গতিতে প্রতিবাদের ফলে অত্যাচারের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিল। কিন্তু একেবারে বন্ধ হইল না। তৈল কম হইলে পুরা না হওয়া পর্যন্ত রাত্রি সাতটাই হউক কাজ করিতেই হইবে। শনিবার সম্পূর্ণ কাজ না দিতে পারিলে রবিবারের আশায় সে দিনের মত রাত্রিকালের জন্য অব্যাহতি দিয়া রবিবার দিবস কাজ করাইয়া কাজ পুরা করিয়া লয়। এক দিবস রবিবারে কাজ করাইয়াছে বলিয়া পরমানন্দ supdt-কে জানায়। তাহার উত্তরে you have nothing

to do with that, you are not superintendent of the jail? পরমানন্দকে একথা বলিল বটে কিন্তু জেলার যে কাজটা অন্যায় করিয়াছে ইহা বুঝিয়া আফিসে যাইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেয় এবং পরে আমরা থাকিতে এরূপ কাজ আর কখনও হয় নাই।

একবার martial law of Gujrat prisoner-দের কোন এক জনের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়। কলুর ডাণ্ডার সঙ্গে তাহার হাত বাঁধিয়া বলপূর্বক ঘুরাইতে থাকে, চলিতে অসমর্থ হইয়া সে ভূমিতে পড়িয়া যায় তখন ভূমির উপর দিয়াই তাহাকে ঘুরাইতে থাকে এ-কারণে তাহার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তধারা বহিতে থাকে। ত্রৈলোক্যবাবু একবার ইহার প্রতিবাদ করেন। সে সময় supdt-এর সঙ্গে তাঁহার বচসা হইয়া যায় সে জন্য তাঁহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয় বটে কিন্তু সে লোকটিকে আর কখনও কলুর কাজে দেওয়া হয় নাই। একথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদের ফলে অত্যাচারের মাত্রা কমিয়া আসিল এবং সকলেই একটু আরাম পাইল।

Jail Reform Committee যখন আন্দামানে যায় তখন একটা চীনাকে ঘানিতে কাজ করিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার ওজন কত এবং কতদিন যাবত কলুতে কাজ করিতেছ?"

তাহার উত্তরে সে বলে, "আমার ওজন ৭০ পাঃ এবং তিন বৎসর যাবত কলুতে কাজ করিতেছি।" এ কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য হইয়া গেল এবং capital town-এ আসিয়াই supdt-কে একখানা কড়া চিঠি দেয়। তথাপি তাহাকে কলুর কাজ বদলাইয়া অন্য কাজ দেয় নাই। আমরা জেলে ছিলাম বলিয়া যে অত্যাচারটা আমাদের চোখেই পড়ে শুধু তাহাই নহে। উহা উপরোক্ত ঘটনা হইতেই পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। অন্যান্য সংবাদ নবম পরিচ্ছেদে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

ছোট ছোট ছেলেদের (prisoner in boys gang) ঘানির কাজে দেওয়া নিষিদ্ধ। তাহাদের জেল অপরাধের জন্য মাঝে মাঝে কলুতে দেওয়া হইত। অতি অল্প বয়সের নাবালক ছেলেদের এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজ দেওয়া যে অন্যায় তাহা শুধু আমাদের নিকটই নহে, উহা সরকারের নিকটও বলিয়াই কলুতে—এমন কি, শক্ত কাজেও দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছে। আমরা সরকারের উক্তির উপরই নির্ভর করিয়া সংগ্রামে ব্রতী হইয়া জয়ী হইয়াছিলাম।



পুলিন বিহারী দাশ

॥ ৩ ॥

বাচ্চা ফাইল

দশম অধ্যায়ে বাচ্চা ফাইল (boys' gang) সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তাহাদিগকে পৈশাচিক অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বারীনবাবু প্রভৃতি প্রথমে অনেক চেষ্টা করেন, এজন্য কু-প্রবৃত্তি পোষণকারী পাঠানগণ "বাঙ্গালীদের" শত্রু হইয়া উঠে। যখন fact and figure দিয়া supdt-কে মুগ্ধ করে তখন তাহার সাহায্যে অনেক নাবালক ছেলেকে বারীনবাবু ও অন্যান্যেরা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করেন। অবশেষে supdt. আমাদের সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরে ছেলেদের বারীনবাবুর হাতে সঁপিয়া দেয়। তখন হইতেই ছেলেদের দুর্গতির পরিবর্তন হইয়া সমস্ত দুঃখের অবসান হইল।

॥ ৪ ॥

জেল

জেলে কয়েদীরা সকাল হইতে বেলা ৪টা-৪॥টা পর্যন্ত নানাবিধ শক্ত কাজ করে কিন্তু বৈকাল বেলা তাহারা স্নান করিবার জন্য জল পায় না। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পাই না। ঘর্মাক্ত কলেবরে লোক সমস্ত দিবস ঘানিতে কাজ করিয়াও এই অবস্থায় যদি তাহাদের দুই দিবস স্নান না করিয়া থাকিতে হয় তবে যে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জলের জন্য সাধারণ কয়েদীরা আমাদের মুখের দিকে চাতকের ন্যায় তাকাইয়া থাকিত।* তাহাদের ধারণা, তাহারা বলিলে কিছু হইবে না— বাবুরা বলিলেই হইতে পারে। আমরা বলিলে আবার জবাব পাইতাম, "তোম্‌লোক্‌কা জরুরত নেহি, তোমলোক কাহাকেওয়াস্তে বল্‌তে", তখন জিদের বশবর্তী হইয়া মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইতাম, "হামলোককো জরুরত হ্যায়।" যদিও এ সকল সামান্য সামান্য বিষয়, তথাপি ইহার জন্যও আমাদের কম শক্তি ক্ষয় করিতে হয় নাই।

পানীয় জল পূর্বে কাহাকেও ১ পাউণ্ডের বেশী দেওয়া হইত না, দরকার হইলেও পাইত না। ইহা নিয়া সময় সময় তুমুল ঝগড়া চলিত।

---

* আমরা এক নম্বর হইতে অন্য নম্বরে যাইতে পারিতাম না। অতএব বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য জল আনিয়া দিত, তখন সকলেরই কাজ চলিত।

নাছোড়বান্দাদের সঙ্গে জয়ী হওয়া সহজ কথা নহে। পরে ভয়ে আমাদিগকে দিত কিন্তু অন্যান্যকে বঞ্চিত করিত। যতদিন সকলের পক্ষে ইহার সুবিধা না হইল, ততদিন পর্যন্ত আমরা প্রতিবাদ করিতে বিরত হইতাম না, ইহার ফল শেষকালে এমন হইল যে কেহ কেহ গোপনে পানীয় জলে স্নান পর্যন্ত করিতে পারিত। এখানে পানীয় জল, জলওয়ালা ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করিতে পারিত না। এই জল ছোঁয়ার জন্য পূর্বে বেত্রাঘাতও কেহ কেহ পুরস্কার পাইয়াছে। আমরা যখন জোর করিয়াই জল স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম তখন উচ্চ-জাতির মধ্যে আর কেহ বাকি রহিল না।

॥ ৫ ॥

পুস্তকালয়

প্রথম যখন রাজনৈতিক নির্বাসিতগণ এখানে আসে তখন এখানে তাহাদের জন্য পুস্তক পাঠের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে এই অসুবিধা দেখিয়া তাহারা নিজেদের বাড়ী হইতে পুস্তক আনায়। সেই সকল পুস্তক গুদামে রাখা হইত এবং সপ্তাহে একবার অর্থাৎ রবিবারে একখানা করিয়া দেওয়া হইত এবং পরের রবিবারে তাহা বদলাইয়া আর একখানা নিজের বই আনিতে পারিত। নিজেদের পুস্তক নিজেরা পাঠ করিবে তাহাও একের পুস্তক অন্যে পাইবে না। ক্রমে যখন তাহাদের পুস্তক বৎসর বৎসর আনিতে আনিতে অনেক জমা হইয়া যায় এবং যত্নের অভাবে নষ্ট হইতে থাকে, তখন supdt-এর নিকট তাহারা এই আবেদন জানায় যে, "আমাদের পুস্তকগুলি আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিলে নষ্ট হইবে না এবং আমরা একে অন্যের পুস্তকও পাঠ করিতে পারিব।" তাহাদের এই আবেদন কোন আমলেই আসিল না। পরে Chief Commissioner-কে জানায় এবং তিনিই ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া central tower-এ একটা রাজনৈতিক নির্বাসিতদের পুস্তক দ্বারা ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপন করিবার আদেশ দেন। Chief Commissioner যদি আমাদের কোন উপকার করিয়া থাকেন তবে ইহাই। এই পুস্তক অন্য কোন নির্বাসিতকে পাঠ করিতে দেওয়া হইবে না আমাদের দ্বারা ইহা স্বীকার করাইয়া লয়। প্রত্যেকেই বৎসরে একটি করিয়া parcel ও একটি করিয়া চিঠি পাইতে পারে। এরূপ ভাবে পুস্তক আনাইতে আনাইতে সকলের পুস্তক একত্র হইয়া পুস্তকাগারে প্রায়

দুই হাজারের অধিক পুস্তক জমা হইল। তন্মধ্যে ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনেক মূল্যবান পুস্তকই জমা হয়; কোনটিরই অভাব থাকে না। আমাদের শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাস এই পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধান করেন। এই পুস্তকালয়ের জন্য কমিশনার সাহেব কতকগুলি নিয়ম করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে একটা নিয়ম ছিল যে, যাহার নামে পুস্তকালয়ে পুস্তক জমা থাকিবে না, সে এই পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠ করিবার জন্য পাইবে না। আমাদের যাহারা শেষে আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গে পুস্তক না থাকাতে অনেকেই অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াছে।

জেল committee যখন আন্দামান পরিদর্শন করিতে যায় তখন জেলে সকল কয়েদীর জন্য পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হয় এবং এ সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য পাশ করে এবং তাহারা ওখানে আসিতে আসিতেই অনতিবিলম্বে সকলের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেয়। এই সংবাদ জেল supdt-এর নিকট পৌঁছা মাত্রই কমিশনার সাহেবকে জানায়। কমিশনার সঙ্গে সঙ্গেই supdt-কে লিখিয়া জানায় "Govt. কিছু টাকা বৎসরে বৎসরে দিবে, রাজনৈতিক নির্বাসিতগণ তাহাদের পুস্তক সকল কয়েদীকে পাঠ করিতে দিতে রাজি আছে কিনা তাহা আমাকে জানাও।"

আমাদিগকে এ সংবাদ জানাইবার পর আমরা কতকগুলি সর্তে সম্মত হই। সর্তের মধ্যে ছিল government-কে এখনই দুই শত টাকা দিতে হইবে, আমাদের পুস্তক আমাদেরই থাকিবে এবং তাহা আমাদের ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারিব, পুস্তক ছিঁড়িয়া গেলে বাঁধাই খরচ government দিবে, তত্ত্বাবধান চিরদিনই আমাদের লোকের হাতে থাকিবে। এই সর্তে government রাজি হওয়া মাত্রই আমরাও রাজি হইলাম, আমাদের মনে যে সদিচ্ছা ছিল তাহা পূর্ণ হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইলাম। সকল কয়েদীকে পুস্তক পাঠ করিতে দিবার জন্য আমরা বহু বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছিলাম। Jail Committee এখানে না আসিলে হইত কিনা কে জানে।

পুস্তকালয় যদিও হইল কিন্তু সাধারণ লোকের পাঠের উপযোগী পুস্তক আমাদের এখানে নাই। পরে আমাদের কেহ কেহ নিজেরা তাহাদের উপযোগী পুস্তক আনাইয়া দেয়। আর government-এর টাকা দ্বারাও তাহাদের পাঠের যোগ্য পুস্তক আনান হয়।

॥ ৬ ॥

কুঠিতে পাত্রের ব্যবস্থা

জেলে রবিবারে ১০টার পর আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ৩টা পর্যন্ত কুঠিতে বন্ধ থাকিতে হয়, কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগের জন্য কোন পাত্রের ব্যবস্থা নাই। ইহার মধ্যে যদি কাহারও মল-মূত্রের বেগ হয় তাহা হইলে কুঠির মধ্যেই কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর অতিরিক্ত চালাক হইলে কুঠির প্রাচীরে প্রস্রাব করিয়া কাজ সারে। রাজনৈতিক নির্বাসিতদিগকে, গুঁতার ভয়ে ডাকিলে খুলিয়া দেয়। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা বড় কদর্য, তাহাদের ঘৃণা নাই বলিলেই হয়। এ-সকল কর্ম তাহারাই বেশী করে। এ বিষয়ে পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা supdt-কে জানাই; জানাইবার পরও এ ভাবেই চলে; আমরাও বার বার এ সম্বন্ধে জানাইতে লাগিলাম। পরে রবিবারে এবং ছুটির দিনে কুঠিতে মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পাত্র দিবার ব্যবস্থা হয়।

॥ ৭ ॥

বাঙ্গালী কাটা

Coir pounding জেলের মধ্যে শক্ত কাজ। আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্বল না হইলে কেহ কাজ হইতে মুক্তি পায় না। প্রথম প্রথম নিয়ম ছিল সমস্ত দিনে যতটা কাজ হইত ততটাই দিতে হইত, কিন্তু তাহাদের কর্তা পক্ষের (S) নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য ২ পাউণ্ড। সমস্ত দিন ভয় দেখাইয়া বে-আন্দাজি কাজ করাইয়া ৩ থেকে ৫ পাউণ্ড পর্যন্ত আদায় করিত। আমাদের নিতান্ত পুরাতন বন্ধুগণ দেখিলেন যে এ নিতান্ত অত্যাচার, তখন তাহারা আমাদের দেশের তুলা দণ্ডের ন্যায় একটা মাপকাঠি তৈয়ার করিল। ইহার নাম "বাঙ্গালী কাটা"। ইহা আমাদের হেমবাবুর আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে সকলেরই শ্রম লাঘব হয়। আজ পর্যন্তও এই কাটার সঙ্গে "বাঙ্গালী"দের নাম জড়িত আছে।

॥ ৯ ॥

বন্দী নিবাস রহিত

১৯১৯ সালে কি ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে জেল কমিটি যখন আন্দামান পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আসেন তখন আমরা সকলে ভিন্ন

ভিন্ন ভাবে ছয় খান দরখাস্ত করি। বারীনবাবু প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালী একটি, নবাগত বাঙ্গালী একটি, সাভারকর একটি. লাহোর মামলার শিখ প্রভৃতি দুইটি এবং ব্রহ্মদেশের ষড়যন্ত্র মামলার একটি। এতদ্ব্যতীত তাহারা সাভারকর, চত্তর সিং, অমর সিং, বারীনবাবু, হেমবাবু প্রভৃতির সঙ্গে এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করে। ইহাব মধ্যে সাভারকরের সঙ্গেই বহুক্ষণ গোপনে Privately আলাপ করে। আমাদের দরখাস্তের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল Andaman penal settlement উঠাইয়া দিবার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখান, ইহা ছাড়া বাহিরের লোকেরাও বেনামা অনেক সংবাদ দিয়া আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমরা যে সকল কারণ দেখাইয়াছি তাহার মধ্যে জলবায়ু খারাপ, মৃত্যুর সংখ্যা অধিক বলিয়া নানারূপ heinous crime হয়, চল্লিশ বৎসরের হিসাব দেখাইয়া দেখান হইয়াছে যে বৎসব বৎসর government-এর ক্ষতিই হইতেছে, সংক্রামক ব্যাধি অধিক পরিমাণে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। নৈতিক চরিত্র হিসাবে এখানে এত নীচ যে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এমন অবস্থায় লোককে এখানে আনিয়া কিছুতেই তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, দৃষ্টান্ত সহ এই সকল ঘটনার সমর্থন করিয়া দরখাস্ত দেই, আমাদের দরখাস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্দামান উঠাইয়া দিয়া সর্বব্যাধির মূল নষ্ট করা। আমাদের এই দরখাস্ত পাইয়া উহা সত্য কিনা জানিবার জন্য তাহারা চেষ্টা করেন। যখন উহা সত্য বলিয়া তাহাদের নিকট প্রমাণ হয় তখন আন্দামান নির্বাসন উঠাইয়া দিবার পক্ষে তাহারা মন্তব্য পাশ করেন, তাহার কারণ আমাদের দরখাস্ত অনুরূপই দেখাইয়াছে, কেবল পরিবর্তন ভাষার। ইহার আন্দোলন জেলে ও বাহিরে খুব হইয়াছিল ইহারই কিছুদিন পরে Home member Hon'ble Mr. Guyne-কে India government পাঠায়, আমরাও সেই সময় একই মর্মে তাহার নিকট একটা দরখাস্ত পাঠাই। তাহার সেখানে আসার উদ্দেশ্য, ক্রমে কোন উপায়ে আন্দামান উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা জানা। তিনি এখানে আসার পর সকল কর্মচারীর ভাত মারা যায় দেখিয়া তাহারা তাহাকে যুক্তিদ্বারা মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে, সাহেবও তাহাতে কতকটা মুগ্ধ হইয়া একটা ধারণা করিয়া যায়। শত হইলেও এখানকার কর্মচারীরা সাদা চামড়া। যে উপায়েই হউক তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতেই হইবে।

Mr. Guyne এখানে থাকিতে থাকিতেই বঙ্গীয় রাজনৈতিক নির্বাসিতগণকে বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া দিবার হুকুম সিমলা হইতে আনয়ন করেন। তিনি যে জাহাজে রওনা হন আমরাও ঠিক সেই জাহাজেই দেশে ফিরি। Mr. Guyne কলিকাতা অবতরণ করিবার কালে আমরা সিঁড়ির ধারে তাহাকে ঘেরিয়া ধরিলাম। তখন তাঁহাকে অনেক প্রশ্নের পর জানিতে পারিলাম যে তাহারা ক্রমে দশ বৎসরের মধ্যে আন্দামান উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

॥ ৯ ॥

খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত

জেলের ভিতরে মারপিট, নির্যাতন ইত্যাদি একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই অত্যাচারের ফলে ভান সিং-এর ন্যায় কত লোক যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, তাহার কেহ হিসাব দিতে পারে না। পরে বোমাওলাদের গুঁতায় এমন অবস্থা হইয়াছিল যে কেহ কাহারও উপর ভয়ে হাত উঠাইত না। পাছে 'বাঙ্গালীরা' সাক্ষ্য হইয়া কোন report বা আন্দোলন করে এই ভয়টা সকলের মধ্যেই সংক্রামক হইয়া উঠে। ছোটখাট অনেক পরিবর্তন এখানে হইয়াছে—জেলে খানা কম-বেশী নিয়া একটা ঝগড়া প্রত্যহ হইয়া থাকে। খোরাকী নিয়া, বসন নিয়া, খাবার ভাল-মন্দ নিয়া অনেক মসলা খরচ করার পর একটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। পরে খাবার কম না হইয়া অধিকাংশ দিন বেশীই হয় এবং ঐ উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য উহাদিগকে দেওয়া হয়—যাহারা ঘানি ইত্যাদি শক্ত কাজে নিযুক্ত।

॥ ১০ ॥

ছাপাখানা

নারিকেল ছোবরার তার দ্বারা দড়ি পাকানই এখানে হালকা কাজ। এতদ্ব্যতীত আর কোন কাজই সহজ নহে। যাহারা লেখাপড়া জানে তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। Writer বা মুন্সি ইত্যাদি কাজের জন্য যে কয়জন লোকের দরকার সে কয়জন ব্যতীত অন্যান্য সকলে একই দুরবস্থা ভোগ করে। আর রাজনৈতিক নির্বাসিতগণ লেখাপড়ার কোন

কাজই পায় না। এ সকল নিয়া অনেক আবেদন-নিবেদন চলে ও ইহা অনেক বৎসর যাবত চলিতে থাকে, কিন্তু সরকারের মতের পরিবর্তন করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। তথাপি আমাদের দাবী ছাড়িলাম না। জেলে যদি ভদ্রলোকের মত কাজ করিতে হয় তবে এমন কাজ ভিতরে নাই, আছে কেবল ফাটকে। সেখানে থাকিলে বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইতে পারে এ কারণে আমাদিগকে ওখানে দিবে না, কারণ আমরা অন্দর-মহলের বাসিন্দা। আমাদের দৃষ্টি চার পরদার বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। জেলে যখন অন্য কোন সহজ কাজ আমাদিগকে দিতে পারে না, আর আমাদের যন্ত্রণায় যখন সরকার অতিষ্ট হইয়া উঠিল তখন জেলে একটা ছাপাখানা খুলিয়া সেখানে আমাদিগকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করিল। তখন হইতেই এ জেলে ছাপাখানার সৃষ্টি। এই ছাপাখানায় আমাদের লোক অপেক্ষা সাধারণ লোকই বেশী সংখ্যায় কাজ করিত এবং তাহারাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম পাইল। পূর্বে লেখাপড়া জানা লোক হইলেও একবার ঘানিতে কাজ করিতেই হইত। এই ছাপাখানা হওয়াতে এবং লেখাপড়া জানা লোকের প্রয়োজন হওয়াতে তাহারা শক্ত কাজ হইতে মুক্তি পাইল।

॥ ১১ ॥

বই বাঁধাই

আমাদের হেমবাবুর অজানা কোন কাজই ছিল না। তিনি যখন আমাদের Librarian ছিলেন তখন আমাদের ছোট ছোট বইগুলি সামান্য সামান্য মাল-মসলা দ্বারা সুন্দর করিয়া গোপনে গোপনে বাঁধিয়া রাখিতেন। হঠাৎ এক দিবস ইহা জেলারের দৃষ্টিতে পড়ে। তখন জেলার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহার দুই-চার খানা পুস্তক এবং বন্ধু-বান্ধবদের দুই-এক খানা পুস্তক সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া লয়। ক্রমে এ সংবাদ supdt-ও জানিতে পারিল এবং সেও তাহার অনেক পুস্তক বাঁধাইয়া লইল। তাহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া হেমবাবু দ্বারা একটা book-binding department খোলে; এখানে আন্দামান গভর্ণমেণ্টের, library ও ছাপাখানার সকল কাজই হইতে লাগিল। রাজনৈতিক নির্বাসিতদের জেল পরিবর্তনের চিহ্নের মধ্যে Library, press, Book-binding, abolition of Andaman

এই কয়টিই প্রধান। আর তাহাদের উপর নির্যাতনের একটা চিহ্ন আছে হাত-কড়ির। সকল নির্বাসিতকে দেওয়ালের গায়ে কয়ড়ার সঙ্গে হাত-কড়ি (standing hand-cuffs) দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের প্রথম দলকে হাত-কড়ি দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। ছাদের মাঝখানে একটা কয়ড়া পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে একটা লৌহ সলাকা ঝুলাইয়া হাত-কড়ি দেওয়া হইত। তাহার উদ্দেশ্য দেওয়ালে বা অন্য কোন স্থানে যেন কোনরূপ সাহায্য লইতে না পারে। এ চিহ্ন আজও বর্তমান আছে, পুরাণো লোককে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে "বাঙ্গালী লোককা হাত-কড়ি।"

হাসপাতালে অসুস্থাবস্থায় ভর্তি হইলে দণ্ডিত লোকের দণ্ড অর্থাৎ বেড়ি মুক্ত করা হইত না। এ-সকল নিয়া আন্দোলন হওয়াতে পরে হাসপাতালে ভর্তি হইলে সকলকেই দণ্ড হইতে হাসপাতালে অবস্থান করার কয় দিবস অব্যাহতি দিত।

এখানে আমরা যত মঙ্গলই করি না কেন, যত পরিবর্তনই হউক না কেন, সাধারণ নির্বাসিত বাঙ্গালীদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমরা এখানে আছি বলিয়া তাহারা warder, writer এরূপ কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ পাইত না। তাহারা দায়িত্বপূর্ণ কাজ পাইলে আমাদিগকে কোন গোপন কাজে সাহায্য করে ইহাই ছিল সন্দেহের কারণ। তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া একটু সুখ-দুঃখের আলাপ করিতে দেখিলেই টিণ্ডেল, পেটি-অফিসার তাহাদের উপর কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে এবং আমাদের অসাক্ষাতে শাসায়। এখানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা খুব অল্প। সুতরাং বঙ্গভাষী বা বঙ্গবাসী জানিলে একটু জানিবার বা আলাপ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হইত কিন্তু সরকারের বাঙ্গালী প্রীতির অভাবে তাহাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইত না। শুধু বাঙ্গালী বলিয়াই যে তাহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিত তাহা নহে। জেলে বাঙ্গালীদের "বাঙ্গালী" বলিয়া যথেষ্ট নাম আছে তাহার জন্যও তাহাদের একটু আলাপ করিয়া জানিবার প্রবৃত্তি বেশী হইত। জেলের ভিতরে বাঙ্গালীদের আদর নাই আমরা এখানে আছি বলিয়া। বাহিরে তাহাদের কেমন আদর আছে তাহা পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

চতুর্দিক রক্ষা করিয়া যাহা বলা যাইতে পারে তাহা বলিলাম, জেলের কথা এখানেই শেষ। আমাদের ওখানে যাবার পূর্বে আমাদের পূর্ব নির্বাসিতদের উপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল তাহা আমরা

চোখে দেখি নাই বলিয়া লিখিলাম না। তাহা পাঠকগণ বারীনবাবু, উল্লাস কর বাবু ও সাভারকরবাবুর পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

এই গেল জেলের কথা। ইহার পর আন্দামানের বাহিরের কথা আরম্ভ করিব, এই বাহিরের বিবরণেই প্রকৃত আন্দামানের পরিচয় পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

আন্দামানে দশ বৎসর



॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

কিছু Haddo Viper ও Ross জিলায় আছে। এ-কসল স্থানে কখনও তাহাদিগকে রাখা হয় না। এই সকল পলাতকদের মধ্যে সেই রকম ভাল লোকও থাকে। তাহাদিগকে একবার সুযোগ দিলেই পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু কখনও তাহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া হয় না। জেল হইতে বাহিরে গেলে যে, যে কাজ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে তাহাকে আবার সেই কাজেই নিযুক্ত করা হয়। অক্ষম বলিয়া কোন দিনই কাজের পরিবর্তন করে না। বার বার এরূপ অত্যাচার ভোগ করিতে করিতে সাধারণ লোকের মধ্যেও একটা প্রতিহিংসার ভাব জাগে। যাহার সাহস ও শক্তি থাকে সে প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্যাতনকারী টিণ্ডেলকেই একদিন মারিয়া বসে। overseer লোক পাইলেই টিণ্ডেল ও জমাদারের হাতে সঁপিযা দেয়। কাজ বিভাগ কবা অনেকটা টিণ্ডেল ও জমাদারের হাতে থাকে। তাহারা ইচ্ছা করিলেই লোককে সুযোগ-সুবিধা ও অবস্থা বিশেষে কষ্টও দিতে পারে। সোজাসুজি ভাবে ইহাদেব দ্বারা নির্যাতিত হয় বলিয়া ইহাদের উপরই কয়েদীদের আক্রোশটা একটু বেশী থাকে। টিণ্ডেল, জমাদাব খুনের মামলা কেবল Bimberly ganj জেলা হইতেই বৎসরে দুই একটা হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে টিণ্ডেল ও জমাদারগিরি পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানদেরই এক চেটিযা। বাহিবে ইহাদেব ক্ষমতা আমাদেব দেশের জেলের Superintendent-এর ন্যায়। সাধারণ অবিবেচক লোকের হাতে অতখানি শক্তি থাকিলে আত্মহারা হইয়া সে যে কত অত্যাচারী হইয়া থাকে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। জমাদার যখন যাহার বিরুদ্ধে বলিবে তাহাই ধ্রুব সত্য। কয়েদী বা অন্য কাহারও কথা সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয। এই সকল কাবণে ভাল লোকও ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া যায়।

একজন গুজরাটি মুসলমানকে একবার জঙ্গল কাজে দেওয়া হয়। সেখানে অসহ্য কষ্ট বলিয়া জেলে আসার অভিপ্রায়ে সে পলায়ন করে। এরূপ উদ্দেশ্যে অনেকেই এক দিন কি দুই দিন গোপনে থাকিয়া ধরা দেয়। জেলের ঘানিটানা জঙ্গল কাজের অপেক্ষা অনেকাংশে সহজ, একথা ভুক্ত-ভোগীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। গুজরাটি কয়েদীটি দুই দিন পরে ধরা দেয় এবং দুই বৎসরের জন্য জেল-দণ্ড প্রাপ্ত হয়। জেলে যাইয়া সে দুই বৎসর বিনা গোলমালে কাটাইয়া আসে। বাহিরে আসা মাত্রই তাহাকে আবার পূর্ব কাজে নিযুক্ত করা হয়। সে জেলে যতদিন ছিল ঘানিতেই

কাজ করিয়াছে। সুতরাং কোন গোলই ছিল না, এবার সে ভীষণ প্রতিশোধ লইবার জন্য পূর্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া পালায়। কিছু টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে এবং ভাল ভাল আরও তিন জন লোককে সাথীরূপে পায়। দুই মাস পর্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে ইচ্ছা করিয়াই আবার ধরা দেয়। ধরা দেওয়ারও একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রহরীদের নিকট হইতে বন্দুক ছিনাইয়া লওয়া। ফলে সে তাহাই করিল; একদিন রাত্রিকালে কপাট ভাঙ্গিয়া একটি বন্দুক ও কার্টিজ লইয়া পলায়ন করে। পলায়ন করিয়া আমরা যতদূর জানি, আন্দামানে থাকা পর্যন্ত সে ধরা পড়ে নাই। মাঝে মাঝে লোকের ঘরে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু খাবার সংগ্রহ করিত ইহাই জানিতাম। লোকটা যতদিন আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল ততদিন তাহার মধ্যে খারাপ কিছুই দেখি নাই। তবে এরূপ কেন হইল পাঠক সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এরূপ হওয়ার কারণ—জঙ্গলের শক্ত কাজ। দণ্ড পাইয়া জেলে ভাল লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছে। সব রকম শক্ত কাজ বিনা বাক্যব্যয়ে করিয়াছে। কোন দিন কোন আপত্তি করে নাই। তাহার সেই সততায় অবিশ্বাস করাতে সে স্বভাবতঃই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রথমে তাহার ধারণা ছিল এখানে ভাল ভাবে থাকিলে বাহিরে ভাল কাজ না হউক মানুষের যোগ্য কাজ দেওয়া হইবে। তাহার সেই ধারণার উপর যখন আঘাত পড়িল তখনই সে বিগড়াইল। এরূপ ইতিহাস অনেক আছে; দুই-একটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট, তাহারা বাহিরে ভাল শিক্ষা পাইলে সেনা বিভাগে অনেক উন্নতি লাভ করিত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই জঙ্গলে কাজ করিতে পারিলেই যে মুক্ত বা জীবনের ভয় নাই তাহা নহে। যদি কখনও কেহ অসাবধান অবস্থায় থাকে তখনই হয়ত হঠাৎ একটি কর্তিত বৃক্ষ উপরে পড়িয়া তাহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলে। এরূপ আকস্মিক ঘটনাও অনেক সময় ঘটে। ঘটিলেই বা কার কি—সবই তো বেওয়ারীস মাল!

রৌদ্র বৃষ্টি সকল ঋতুতেই জঙ্গলের মধ্যে কাজ করিতে হয়। জঙ্গল কাটা, নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করা, মাটি কাটা, পাথর ভাঙ্গা, বাগান করা, রবার চাষ, চা-এর চাষ ইত্যাদি অনেক শক্ত কাজ এই জঙ্গল কাজের অধীন। ইহার কোনটাই সহজ নহে। ইহার মধ্যে গাছ কাটা ও রবার

কাজ (মাটি কাটা) সর্বাপেক্ষা কঠিন। মাটি কাটিবারও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় কতটা দৈনিক কাটিতে হইবে প্রত্যেক দিন তাহা প্রত্যেককে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা এই কাজ করিয়াছে তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে ইহা খুব কঠিন। অনেকেরই দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ প্রত্যহ হয় না। সে জন্য বেড়ী প্রভৃতি দণ্ড তো আছেই, তাহাতেও নিস্তার নাই। আর সেই বেড়ী লইয়াই কাজ করিতে হয়। রজনী প্রামাণিক নামে একজন বাঙ্গালী একবার এই মাটি কাটা কাজ হইতে পলায়ন করে। সেজন্য প্রথমে তাহার দুই বৎসর জেল ও তিরিশ বেত দণ্ড হয। ইহার পর প্রত্যেক বারেই তাহাকে এই একই কাজে নিযুক্ত করা হইত। আর প্রত্যেক বারেই সেও জেলের বাহির হইয়া দেড় মাসেব মধ্যেই পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিত। আমরা তাহাকে চাব-পাঁচ বার এইরূপ ভাবে জেলে আসা-যাওয়া করিতে দেখিযাছি। তাহার কারণ তাহা দ্বারা একাজ হইত না এবং এ কাজ ব্যতীত তাহাকে অন্য কোন কাজও দেওয়া হইত না। ইহার সোজা অর্থ তাহাকে জেলে যন্ত্রণা দিতে দিতে প্রাণে মারা। লোকটার দণ্ডকালেব বিশ বৎসর অতীত হইয়াছিল। ৩০২ ধারায় সে যাবজ্জীবন দণ্ড পায়। এই ধারায় সাধারণতঃ বিশ বৎসরের বেশী দণ্ড ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু সে একবার পলায়ন করিযাছিল বলিয়া তাহাব মুক্তি চিরকালের জন্য বন্ধ। জেলে লোকটা আমাদের অত্যন্ত ভক্ত ছিল। ববিবাব আসিলেই বাবুদের কাপড় ধুইয়া ও অন্যান্য কাজ কবিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত।

সময়ে সময়ে নাচ দেখাইয়া বাবুদের নিকট হইতে কিছু খাবারও আদায় কবিত, যখন আমি রস্ হাসপাতালে ছিলাম তখন সময় সময কেবানীদিগকে সাহায্য করিতাম। সেই সময় হঠাৎ একদিন Death report-এ দেখি রজনীব নাম। তাহার মৃত্যু সংবাদ সেদিন আমাদেব সকলের প্রাণেই বেশ দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল। বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া যাওয়ার পর তাহার মনে বড় আশা হইয়াছিল যে, সে দেশে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু এই জঙ্গল কাজের নির্যাতনেই তাহার আর দেশে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। বেচারার বাম হাতটি বিকল ছিল, তাহা দ্বারা মাটি কাটা ও ঘানি টানা উভয়ই শক্ত।

জঙ্গলে যে সকল গাছ কাটা হয় উহা স্থানান্তরিত করিয়া সমুদ্রের জলে

ভাসাইয়া কাঠের গোলা Chattam আনা হয়। সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে সে সকল বৃক্ষ ছেদন করা হয় উহা হাতী দ্বারা সমুদ্রতীরে আনা হইয়া থাকে। এই কাজের জন্য বাবোটি হাতী আছে। কয়েদীদের আহারাদি সম্বন্ধে যে নিযম, হাতীগুলিরও ঠিক সেই একই নিয়ম। ইহাদের খাদ্যের একটা পরিমাণ আছে। ইহার বেশী কখনও তাহারা পায় না। কয়েদীর পক্ষে যেমন সশ্রম কাজের ব্যবস্থা, উহাদের পক্ষেও ঠিক তেমনি। বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডগুলির সঙ্গে সেই শিকল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। শুঁড় দ্বারা উহা টানিয়া লইয়া যাইতে হয়। যখন উহাদের শক্তিতে আর কুলায় না তখন তাহারা অসহায়ভাবে চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু চীৎকার করিলেও মুক্তি নাই। কুড়ালির পর কুড়ালি মাথায় পড়িতে থাকে। তাহাতেও কোন ফল না হইলে তখন সে কাজ না করার অপরাধে কয়েদীর মাড়-ভাতের (penal diet) ন্যায় উহারাও দণ্ড পায়। অল্প খানা, দাল বন্ধ (বিশ সের করিয়া ধান) শুধু গাছের পাতা ইত্যাদি রকমের দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। বেশী শাস্তি যদি দেয় তবে একেবারে খানা বন্ধ। হাতিগুলির অস্থি-চর্ম সার, শরীরের সকল অস্থি ভাসিয়া উঠিয়াছে।

এই সকল স্থানে নানাবিধ কাষ্ঠ জন্মিয়া থাকে। গত জার্মান যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে হাওয়াই জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য এক প্রকার হালকা রকমের কাষ্ঠ এই স্থান হইতে রপ্তানী হইত। ইহা ভিন্ন কলিকাতা ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে কাষ্ঠ রপ্তানী হইয়া থাকে। এ জেলাতেই আমাদের ফণীবাবু ও যতীনকে পাঠান হইয়াছিল। তাহারা যে স্থানে ছিল সে স্থান অত্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রধান। তাহারা প্রতি মাসেই ম্যালেরিয়ায় ভয়ানক ভাবে ভুগিত। হাসপাতাল হইতে ছুটি হওয়ার পর আট-দশ দিন যাইতে না যাইতেই তাহারা আবার হাসপাতালে আশ্রয় লইত। এই ভাবে তাহারা তাহাদের দুঃখ-রাতের-দিন কোন রকমে কাটাইত, ইহাতে যতীনের স্বাস্থ্য ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায়। নাক হইতে মাঝে মাঝে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করে। জেলে তাহার স্বাস্থ্য ভালই ছিল, এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া তাহাকে অনেক দুর্ভোগই ভুগিতে হয়।

লর্ড মেওর হত্যা

পাঠানদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহারা যে সরকারের বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছে এ কথাই কেবল বলা হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া যে তাহারা এ সুযোগ পাইল সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। সর্বপ্রথমে এই স্থানে সকল নির্বাসিতের উপরই সমান অত্যাচার হইত। সে অত্যাচার অমানুষিক, যাহা সকল মানুষ সহ্য করিতে পারে না। পাঠানগণ স্বভাবতঃ বীর ও সাহসী। বীরের ন্যায় মৃত্যুকে তাহারা গৌরবের মনে করে এবং বীরকে সম্মানের চক্ষে দেখে। তেমনই ভীরু লোককে আবার ঘৃণা করে, জাতির কলঙ্ক বলিয়া মনে করে। অত্যাচার পীড়িতের নিকট অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠে তখন তাহারা প্রাণকে তুচ্ছ এবং প্রত্যহ তিল তিল করিয়া মরা অপেক্ষা এক দিনে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষ হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করে। এই স্থানে এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারের ভিতর অনেকেরই মনে এই ধারণা হইয়া থাকে।

লর্ড মেও যখন আন্দামান পরিদর্শন করিতে যান তখন সেরালী নামক এক পাঠান জীবনের সকল জ্বালা মিটাইবার অভিপ্রায়ে সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে থাকে। সেই সময়ে সে নাপিতের কাজ করিত। এই স্থানে চুল ও দাড়ি ক্ষুর দ্বারা পরিস্কার করিবার নিয়ম। এই কাজের জন্য তাহার নিকট সকল প্রকার অস্ত্রই থাকিত। অস্ত্রাদি থাকিলেও সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইচ্ছানুরূপ একখানা ছোরার ন্যায় অস্ত্র কোথা হইতে যোগাড় করে।

লর্ড মেও পরিদর্শন কালে যে সকল পথ দিয়া চলিতেন সে সকল স্থানে কড়া পাহারা থাকিত। সেই সকল রাস্তা দিয়া কোন লোক চলাচল বা পার হইতে পারিত না। সম্মুখে ও পিছনে প্রহরী সকল শরীর রক্ষকরূপে চলিত। সেরালী তিন দিবস যাবৎ তাহার উদ্দেশ্য লইয়া ফন্দি আঁটিতেছিল, কিন্তু কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পর সে একদিন রাস্তার ধারে বনে লুকাইয়া রহিল। লর্ড মেও যখন সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছেন, তখন সেরালী হঠাৎ বনের মধ্য

হইতে বাহির হইয়া লর্ড মেওকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে তিনি ভূতলশায়ী হন। তখন মেওর রক্ষীরা আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলে। তারপর তাহাকে বন্দী করিয়া রস দ্বীপে গোরা পাহারার অধীনে রাখে।

শুনিয়াছি সেরালী অত্যন্ত সবল ও দীর্ঘকায় ছিল। হাজতে থাকার সময় একদিন যখন স্নান-আহার করিবার জন্য তাহাকে ঘরের বাহির করা হয় তখন গোরা প্রহরীদের মধ্যে দুই জনকে এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া সে শেষ করে। ব্যবহার ও আহার ভাল ছিল না ইহাই আক্রমণের কারণ। ইহার পর উপর হইতে তাহাকে ভাল খাবার ও পরিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

তাহার বিচার Dy. Commissioner-এর নিকট হয়। বিচারে সেরালী মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পরে C.C-র* নিকট আপিল হয়। আপিলেও সেই একই আদেশ বহাল রহিল। কলিকাতা হাইকোর্টে তাহার মামলার কাগজপত্র পাঠান হয়। সেখানেও সেই একই আদেশ। তাহার বিচারের সময়ে সে জবানবন্দীতে তাহার সমস্ত দুঃখের কথা ব্যক্ত করে। তার মর্মার্থ—এখানে সরকার বাহাদুর কয়েদীর উপর চিরকাল অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রতিকারের জন্য বহুবার অভিযোগ করা হইয়াছে কিন্তু কেহই সে আবেদন কর্ণে স্থান দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গভর্নরের নিকট নালিশ করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহাতেও বাধা পাইলাম। যদি আপ্রাণ চেষ্টার পর কোনও উপায়ে নালিশের জন্য উপস্থিত হইতেও পারিতাম তবে আমার উপর এইরূপই ৩০২ ধারার অভিযোগ আসিত। নিজের জীবন দিয়া যদি আর দশ জনের অত্যাচারের মাত্রা কিছু কমাইতে পারি, যদি তাহাদের সকলের দুঃসহ দুঃখের বোঝা সামান্যও হালকা করিতে পারি, তবেই আমার এই মরণ বরণ গৌরবের হইবে। এই কথা মনে করিয়াই আমি স্বেচ্ছায় এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই এবং উপযুক্ত পাঠান সন্তানের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিতেছি বলিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।"

সেরালীর এই সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া সরকারের চক্ষু খুলিল। তাঁহারা শ্রেণী বিচার না করিয়া যে অত্যাচার করিয়া চলিয়াছিলেন ইহার

---

* Cap. Dogglas.

পর আর তাহাদের সে সাহস রহিল না। ইহার পর হইতেই স্থানীয় গভর্নমেণ্ট একটু সংযত হইলেন। বিশেষ করিয়া পাঠানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ কখন কাহার হত্যার চেষ্টা হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পাঠানদিগকে বাছিয়া বাছিয়া আরামের কাজ দিতে এবং জমাদার, টিণ্ডেল, পেটি-অফিসার, আরদালী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। বর্বর জাতিকে এই সুযোগ দিয়া এই স্থানের অবস্থা ক্রমে ক্রমে এমন করিয়া তুলিলেন যে পাঠানদের যন্ত্রণায় অন্যান্য কয়েদীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বারীনবাবুর পুস্তকে পাঠান জমাদার মিরজা খাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। পাঠকগণ উহা পাঠ করিলে কিছু আভাস পাইবেন। আজ পর্যন্তও পাঠানগণ এখানে প্রাধান্য চেষ্টার চিন্তা করিতেছে। এখানে তাহারাই বিশ্বাসী, তাহারাই সরকারের একমাত্র বন্ধু।

তবে চিরকাল এক ভাবে যায় না। তাই আজকাল মাঝে মাঝে বিপরীত ফলও ফলিতেছে। পাঠান জমাদার ও টিণ্ডেলগণ সকল কয়েদী বিশেষতঃ হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে বলিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটির গুরুতর মামলাও দেখা দিতেছে। এইরূপ একটি মামলার লোককে জেলে দেখিয়াছি। তাহারা সাত জনে ষড়যন্ত্র করিয়া এক পাঠান জমাদারকে হত্যা করে। জমাদারের অপরাধ—সে যে কেবল কাজে নিযুক্ত কয়েদীদেরই কষ্ট দিত তাহা নহে। সে টিণ্ডেল প্রভৃতিকেও বাগে পাইলে ছাড়িত না।

আমরা জেলে যাওয়ার পর হইতে বিশেষ করিয়া আমাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে শেষকালে পাঠানদের সংখ্যা কম হইয়া আসিয়াছিল।

কয়েদীর ক্রম উন্নতি

দেশ হইতে নির্বাসিতগণ আসিয়া জেলে থাকার অবস্থায় Star gang হইলে* স্থানাভাবে warder হইতে পারে। Star gang-এর অভাব হইলে সোজা টিকেট পর্যন্ত warder হয়। জেলের ওয়ার্ডাররা পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর মাসে বারো আনা করিয়া বেতন পায় ও তিন মাস অন্তর একদিন (রবিবার) ৮টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বাহিরের পাশ লইয়া বেড়াইতে যাইতে পারে। পেটি-অফিসারের অভাব হইলে পেটি-অফিসার এবং এইরূপে জমাদার পর্যন্ত হইতে পারে। কয়েদীদের মধ্যে warder ব্যতীত অন্য কাহারও বেতন নাই, আবার জমাদার পদ পাইবারও একটা নিয়ম আছে ; দশ বৎসর অন্তর এক টাকা মাসে বেতন না হইলে কেহ জমাদার হইতে পারে না। ভাল লেখাপড়া জানিলে লেখাপড়ার কাজ পাইতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত। কার্যকরী জ্ঞান থাকিলে কোন কার্যশালায় (woıkshop) মিস্ত্রীর কাজ পাইতে পারে। warder-রা জেলের ভিতরে থাকে আর পেটি-অফিসার, টিণ্ডেল ও জমাদার রাত্রিকালে জেলের বাহিরে থাকিতে পারে এবং দিনের বেলায় পালা অনুসারে জেলের তত্ত্বাবধান করে, জেলে এই পর্যন্তই উন্নতি।

বাহিরে যাহারা উর্দু ও ইংরেজী জানে তাহাদের কোন কষ্ট হয় না। তাহারা যেখানে থাকে সেখানেই আদর ও বকসিস্ পাইয়া থাকে। জেলের আর বাহিরের অবস্থা একই। পাঁচ বৎর পর বারো আনা এবং দশ বৎসর পর মাসে এক টাকা হিসাবে বেতন পায। বাহির ও জেলের সঙ্গে এইটুকু পার্থক্য যে ওয়ার্ডার হইতে জমাদার পর্যন্ত জেলে এবং বাহিরে সকলেই বেতন পাইয়া থাকে। লেখাপড়া জানা লোকেরা writer বা মুন্সি এই সকল কাজ পাইয়া থাকে। এই সকল কাজ বিভাগানুসারে ক্ষমতারও সীমাবিভাগ আছে। যেমন District magistrate-এর Writer ও মুন্সির ক্ষমতা সকলের অপেক্ষা বেশী এবং C.C-র মুন্সি সকলের উপর। এই মুন্সির কাজ আবার উর্দু না জানিলে কেহ পায় না।

---

* Star gang ৩০২ ধারায় আসামীগণ হ্ইতে যদি তাহারা হঠাৎ অনিচ্ছাসত্বে খুন করিয়া ফেলে।

হাসপাতাল সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে। সেখানে লেখাপড়া জানা লোকেরা কিছু কিছু সুবিধা পাইয়া থাকে। Ist, 2nd, 3rd, grade Compounder, Writer, মুন্সি এবং attendants প্রভৃতি পদগুলি তাহারা পাইয়া থাকে।

Workshop-এ Foreman, Writer, Instructor (Design maker) নক্সা অঙ্কনকারী এ সকল কাজ দেওয়া হয়। এই সকল কাজ চালাইবার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানেই একজন লোক বসাইয়া দেয়। তাহারা কয়েদী দ্বারা অল্প খরচে অনেক কাজ পাইয়া থাকে। এইভাবে তাহারা যখন যে ভাবে পারে সেই ভাবেই নিঃশেষে কয়েদীদিগকে খাটাইয়া লয়। বিনা পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র পারিশ্রমিকে এইরূপ দুঃসাধ্য কাজ করিয়াও কয়েদীদের নিস্তার নাই।

Ticket leave-এরও একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থার ফল খুব অল্প লোকেই ভোগ করিতে পারে। কয়েদীদের জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা কাগজে-কলমে দেওয়া হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়, কার্যক্ষেত্রে তাহা বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। তাই শতকরা এক জনও সে সুবিধা পাইলে যথেষ্ট মনে করে। দশ বৎসরের মধ্যে যদি কোন কয়েদী জেল-দণ্ড না পায় ও তিরিশ টাকা জমা দিতে পারে, তবে কিছু ভূমি ও বাহিরে স্বাধীন ভাবে বাস করিবার অধিকার পায়। তাহারা ইচ্ছা করিলে জমিতে চাষ করিয়া নিজের খোরাক-পোষাক জোগাড় করিতে বা কোন বিশেষ কাজের যোগ্যতা থাকিলে সরকারী কাজ করিতে পারে। এবং তাহার বিনিময়ে মাসে দশ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকে।

কয়েদীদের মধ্যে যাহারা Ticket leave হইয়াছে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া হয়। এই বিবাহিত Ticket leave দিগকে ভিন্ন স্থানে বাস করিতে দেওয়া হয়। যে স্থানে তাহারা থাকে সেই স্থানে আবার অবিবাহিত ticket leave দিগকে বাস করিতে দেওয়া হয় না। টিকেট লিভ হওয়ার জন্য যেমন শক্ত নিয়ম আছে তেমনি বিবাহ সম্বন্ধেও অনেকগুলি নিয়ম আছে। এই সকল কারণে দুই শত লোকের মধ্যে এক জনও বিবাহ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। বিবাহ সম্বন্ধে অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

অপরাধ বেশী হয় কেন ?

মানুষের ধৈর্য আছে কিন্তু তাহারও একটি সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে মানুষের রূপ ভিন্ন হইয়া যায়, তখন ভাল লোককেও অনেক অস্বাভাবিক কার্য করিতে দেখা যায়। মানুষ যখন পেটের ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না তখন নিজের সন্তানকেও হত্যা করিয়া ফেলে; যখন বাঞ্ছিত বস্তু লাভে বঞ্চিত হয়, তখন বাসনার পিছনে পিছনে ছুটিয়া জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। এ স্হানে লোকে যে অধিক অপরাধ করে উহার কারণও অনেকটা সেইরূপ।

এই স্হানে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ অনেক বেশী, আবার পুরুষগণ ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারে না, পুরুষ-স্ত্রী সকলেই যাবজ্জীবনের জন্য এখানকার অতিথি, তাহাদের মধ্যে কেহই ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী হইয়া আসে নাই। আর তাহাই যদি হইত তবে সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া, কেহ বা নিজের স্বামীকে বিষ সেবন করাইয়া এখানে আসিবে কেন ? এখানে আসিবার সময় তাহারা সকল কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়া আসে নাই। বহু দিবস সেই কু-প্রবৃত্তিগুলি চাপা পড়িয়া আছে। হঠাৎ যদি কোন প্রলোভনের বস্তু সামনে আসিয়া পড়ে তখন তাহা লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে। বহু দিনের চাপাপড়া ভাব হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে তাহার গতি রোধ করিতে তাহারা পারে না।

নির্বাসনে ভাল-মন্দ দুই প্রকারের লোকই আছে। কিন্তু ভালর সংখ্যা অতি অল্প। মন্দ লোক যাহারা তাহারা নিজের বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ সর্বদাই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের দৃষ্টি থাকে অল্প বয়সের সুন্দর ছেলেদের প্রতি। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিবার জন্য তাহারা সচেষ্ট হয়। একই ছেলের উপর যখন অধিক লোকের দৃষ্টি পড়ে, তখনই পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এই বিবাদ ক্রমে বড় হইয়া শেষকালে, লাঠালাঠি এবং খুনাখুনী পর্যন্ত হইয়া থাকে। কেহবা ছেলেকে খুন করে, আবার কেহবা বিপক্ষদলের লোককে হত্যা করে। বহু পূর্বে এই সকল কারণে কত লোকের যে ফাঁসিকাষ্ঠে

ঝুলিতে হইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ নাই। বাচ্চা ফাইল সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ইহাই এ স্থানের অপরাধের প্রধান কারণ। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে একে অন্যের সর্বনাশ করিতে যখন প্রবৃত্ত হয়, তখন সে কার্যে বাধা পাইলেই হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসে ; পরে কি হইবে সে সম্বন্ধে কোনই চিন্তা করে না।

যে সকল লোক বিবাহ করিয়া কোন গ্রামে বাস করে এবং সে সকল স্থানীয় লোক তাহাদের বস্তীতে স্ত্রী-বন্যাসহ বাস করে সেই সকল স্থানেব মেয়েদের উপব অমানুষিক অত্যাচার করিবার জন্য প্রতাপশালী কয়েদীবা অনেক চেষ্টা করে। আর কয়েদীদের স্ত্রীলোকও কযেদী, তাহাদের স্বভাবটাও যে কেমন হইতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পুরুষ সংযমের অভাবে এবং স্ত্রীলোকেব আকর্ষণে যখন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয় তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে। এই স্থানের স্থানীয় লোকেব স্ত্রীজাতি বড় ভাল নহে। পুরুষগুলিও তেমনই। ইহারা অল্প বয়সেই এই সকল অপরাধে অভ্যস্ত হয়। সতীত্বের অভাবের দোষে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই দোষী। স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলিয়া যত অপরাধ হয় অন্য কোন কারণে তত হয় না। এতদ্ব্যতীত নির্যাতন অসহ্য হয় বলিয়া অনেক সময় অপরাধ করে। এ স্থানে চুরি-ডাকাতির কোন মামলা নাই. ঘুস খাবার অপরাধ, অপরাধ নহে. কারণ উহা সকলেই করে। আমরা যাহা দেখিয়াছি ইহাতে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে নৈতিক চরিত্র হীনতার অভাবই সর্ববিধ অপরাধের মূল। যাহাদের মধ্যে সে জ্ঞান আছে তাহারা কখনও কোন অপরাধ করে না।

চোখের সামনে বাজারে অনেক জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দেখিলেই অনেক সময় লোভও হয়। যাহারা সেই লোভ সম্বরণ করিতে না পারে, তাহারা জুয়া ইত্যাদি অবৈধ উপায় অবলম্বনে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। কয়েদী হইলে কি হইবে ; ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি তো আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হয় নাই, তাহারা স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জুয়া খেলার জন্য অনেক সময় একে অন্যে ঝগড়া করিয়া উভয়েই দণ্ড পায় এবং জেলে যায়। তাহার মূল কারণ অর্থাভাব। সাধারণ ভোগ-বিলাসের জন্য যদি প্রত্যেক কয়েদীকেই মাসে মাসে উপযুক্ত পরিমাণ কিছু কিছু দিত তবে বোধ হয় কয়েদীর জুয়া খেলা প্রয়োজন হইত না। পাঁচ বৎসর পর যাহা দিয়া থাকে ভাগ-বাটরা হইয়া তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

বিবাহ পদ্ধতি

আন্দামানের যাত্রীরা যখন দেশের বিভিন্ন জেলে থাকে তখন তাহাদের নিকট প্রচার হয় যে এখানে আসিলে লোককে স্বাধীন ভাবে যথা ইচ্ছা তথা গমনাগমন করিতে দেয়, বিবাহ করিতে দেয় ইত্যাদি, কিন্তু এখানে যে তাহার কিছুই দেওয়া হয় না তাহা পাঠকগণ জানিতে পারিয়াছেন। এ স্হানে ছাড়িয়া দেওয়া আর বিবাহ করিতে দেওয়া এই সুযোগ কেবল Ticket leave লোকেরাই পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্যও যেমন শক্ত নিয়ম আছে তাহা পূর্বে কতকাংশ জানিতে পারিয়াছেন। আর এখন কিছু লিখিব। টিকেট লিভ হবার যে সকল নিয়ম তাহা প্রতিপালিত হইলে টিকেট লিভ হওয়া যায়। দশ বৎসর এই নিয়ম প্রতিপালন-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে এবং তাহা হইতে পারিলে তৎপরে বিবাহের যোগ্যতা দেখাইতে হয়।

টিকেট লিভ হইলেই তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রামে বাস করিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া চৌকীদার আছে। সেই চৌকীদার আমাদের গ্রাম্য চৌকীদারের ন্যায় নহে। তাহারা গ্রামের জবাবদার। কোন লোক দূরে কোথাও ভ্রমণ করিতে গেলে, রাত্রিকালে অনুপস্থিত থাকিতে হইলে, একে অন্যে ঝগড়া করিয়া একে অন্যের ক্ষতি করিলে চৌকীদারকে জানাইতে হয়। কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার জন্য চৌকীদারকে দায়ী করিয়া থাকে। এই চৌকীদারই তাহাদের সাক্ষাৎ মালিক। চৌকীদার আন্দামানের নবীন স্বাধীন* লোক হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকে। তাহাদের মাসিক সামান্য একটা বেতন আছে। উহা সরকার দিয়া থাকে।

এই সকল লোকদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে C.C-র নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। দরখাস্তে তাহাদের নাম, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি এবং জন্মস্থানের সম্পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিতে হয়। ইহার

* Writer। এ স্থানে সাধারণতঃ কেরাণী বলিলে খ্রীষ্টানদিগকে বুঝায়।

পর পুরুষকে স্ত্রী জেলে এক দিবস লইয়া যায়। সে স্থানে বিবাহেচ্ছুক স্ত্রীলোকদের মধ্যে দশ-বারো জনকে লাইন করিয়া দাঁড় করান হয়। ইহার মধ্যে কাহাকে বিবাহের জন্য মনোনীত করে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়া থাকে। যদি কাহাকেও মনোনীত করে তৎপর সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করা হয় সে সম্মত আছে কি না। স্ত্রীলোকটি সম্মতি প্রকাশ করিলে তাহাব জন্মস্থানের খবর লওয়া হইয়া থাকে; সে স্হানে তাহার স্বামী, মাতা-পিতা আছে কিনা, কোন ধর্ম ও জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ Magistrate-এর নিকট হইতে আনাইয়া লয়। শুধু যে এটুকু জানিলেই এবং উভয়ে এক ধর্ম-জাতি ইত্যাদির মিল হইলেই বিবাহ করিতে পারে তাহা নহে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীর স্বামী জীবিত থাকিলে তাহার এবং পুরুষের স্ত্রী থাকিলে তাহাব সম্মতি না হইলে বিবাহ হইতে পারে না। এই সকল অনুসন্ধানের পব এবং উভয় পক্ষের বাড়ীব লোকের অনিচ্ছা না থাকিলে তবে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন স্হানীয় সরকারের আধার কু-প্রথা প্রচার (Corruption introduce) করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিয়ম আছে। যথা ঘরের দুইটি দ্বার রাখিতে হইবে, একটির বেশী দুইটি ঘব থাকিবে না। স্ত্রীর উপর কোন সন্দেহ এবং স্বাধীনতাব উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। আরও এমন অনেক ঘটনা আছে যাহা সর্বসাধারণের নিকট বিবৃত করা যায় না।

নির্বাসিত জমাদারের প্রতাপ

জমাদার হইতে ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলেরই ক্ষমতানুসারে প্রতাপ দেখাইবার প্রবৃত্তি কম নহে। ইহার আংশিক প্রমাণ জেলের অবস্থা বর্ণনাকালে লেখা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বাহিরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাসিতদের অত্যাচার সাধারণ নির্বাসিতদের উপর কিরূপ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণনা করিব।

বাহিরে পেটি-অফিসার, টিণ্ডেল, জমাদার, মুন্সি, কেরাণী* প্রভৃতি আছে; জেলের ন্যায় এ স্থানে ওয়ার্ডার নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে জমাদারই একরূপ কর্তা। যে সকল লোক লেখাপড়া জানে তাহারা মুন্সি ও কেরাণী প্রভৃতি হয়, আর জমাদার প্রভৃতি যাহারা হয় তাহারা নিরক্ষর, সুতরাং নিরক্ষর লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাহারা যে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে না একথা জোর করিয়া বলা যায় না। এ স্থানে সরকারের পাঠান-প্রীতি আছে, তাহার কারণসহ অনেক কথাই পূর্বে বলা হইয়াছে। কাজে কাজেই এই লোকই যে নির্যাতনকারী বা জমাদার প্রভৃতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ করার কিছুই নাই। হাজার বারো শত লোকের উপর একজন জমাদার কর্তা। এই স্থানের কর্তৃপক্ষ যখন তাহার ইঙ্গিতে চলে তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। একজন লোককে বিনা কাজে বসাইয়া খাওয়াইতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে বিনা অপরাধে একজনকে নিষ্পেষিত করিতে পারে। এই বারো শত লোক জমাদারদিগকে ধর্মরাজের ন্যায় ভয় করে। তাহার রান্না করার জন্য দুই জন, গা মলবার জন্য দুই জন, আর্দালীর ন্যায় দুই জন, তোষামোদ করার জন্য দুই জন, ছোকরা জুটাবার জন্য দুই-চার জন, ঘুষের বন্দোবস্ত করার জন্য দুই-চার জন এবং এতদ্ব্যতীত অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অল্পবয়স্ক সুন্দর দুই-চার জন ছেলে থাকে।

---

* যাহাদের বংশ কয়েদী হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহাকে সকল কাজের জবাবদার করা হইয়াছে কিন্তু তাহাকে কোন কিছুর জন্য পরওয়া করিতে হয় না। কয়েদীদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেচ্ আছে। প্রত্যেক বেচের জন্য জমাদারের অধীন টিণ্ডেল, পেটি-অফিসারগণ দায়ী। কিছু নষ্ট হইলে, কাজ পুরা না হইলে, কয়েদীগণ পরস্পরে ঝগড়া করিলে প্রথম জবাব দিতে হইবে তাহাদের, আর দণ্ড পাইতে হইলে পাইবে কয়েদী না হয়তো টিণ্ডেল, পেটি-অফিসার। জমাদার কেবল সুখভোগের মালিক আর দুঃখ পাইতে হইলে পাইবে অপরে।

অর্থ সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি সকলেই রাখে। বিশেষতঃ বিনা শ্রমে অর্থ উপার্জন হইলে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। এক একজন জমাদার বিনা শ্রমে দশ-বারো বৎসরের মধ্যে দুই থেকে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করে। বেতন পায় মাসে নয় টাকা আর সরকারী খোরাক। এই উপার্জন হইতে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করার উপায় কি হইতে পারে? চুরী করে না, ডাকাতি করে না বা কোন ব্যবসা করে না, তবে কোথা হইতে অর্থ আসে? বলিতে হইবে সে অর্থ উপার্জনের কোন গোপন উপায় আছে। সে উপায় এখানে কিছুই নহে। গোপনেও হয় না বা ব্যবসা দ্বারাও অর্থ আসে না।

এইস্থানে কয়েদীরা পাঁচ বৎসর অন্তর বারো আনা মাসিক বেতন পায়। পয়সা কিছু হাতে আসিলেই জুয়াখেলা শিখে এবং তাহা দ্বারা কেহ কেহ কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে। মাসিক বেতন হইতে জমাদারকে কিছু কিছু না দিলে তুষ্ট হয় না, কাজেই প্রত্যেকের নিকট হইতে অল্প পাইলেও মাসে যথেষ্ট হয়। জুয়া খেলা এখানে গুরু অপরাধ। ধরা পড়িলেই জেল। সুতরাং প্রত্যেক জুয়ারীকেই মাসে মাসে কিছু দিতে হয়, যদি ধরা পড়ে তবে তাহার উপর আরও কিছু দিতে হয়। এই গেল উপায়ের সহজ পন্থা। ইহার উপর আরও যদি কিছু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে যাহার নিকট যথেষ্ট টাকা আছে তাহাকে শক্ত কাজে দেয় এবং স্বেচ্ছায় সে ঘুষ দিয়া সে কাজ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে। জমাদারের এই উপার্জনের উপর কিছু ভাগ-বাটরাও আছে। মুন্সির ক্ষমতাও প্রায় জমাদারের ন্যায়, কিন্তু সকল কয়েদী জমাদারের হাতে বলিয়া তাহার বেশী লাভ হয় না। আবার মুন্সিকে বাদ দিলে জমাদারের স্বেচ্ছাচারিতাও চলে না। এইজন্য তাহাকে, খোদ কর্তাকে (overseer)

এবং পুলিশকে কিছু কিছু দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করে। কয়েদীদের খাদ্যদ্রব্য হইতে অল্প অল্প চুরি করিয়া বাসন বিক্রীর টাকাও মাসে সহজ-সামান্য হয় না। এ সকলের উপর আবার সরকারের মাল চুরী করিয়া বিক্রী। ইহাতে কয়েদীর কোন ক্ষতি নাই বটে কিন্তু ধরা পড়িলে দণ্ড পাইবে কয়েদী।

জমাদারের এই শোষণ হইলেই শেষ নহে। তৎপর টিণ্ডেল, পেটি-অফিসার, পাচক-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও এইরূপ উপায়ে বেশ কিছু উপার্জন করে। একটি লোক মাসে বারো আনা পাইলে সে চার আনার বেশী ভোগ করিতে পারে না। কয়েদী-বৎসর হাড়ভাঙ্গা শ্রম করিয়া মাসে বারো আনা পায়। ইহাই যাবজ্জীবন নির্বাসিতদের আত্মভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তির সম্বল। এ স্থানে আসিবার পূর্বে তাহারা সংযম শিক্ষা করিয়া আসে নাই। সুতরাং তাহাদের যে জীবনে কিছুই ভোগ করিবার ইচ্ছা হবে না একথা বলা যাইতে পারে না। জীবনে অনেক কিছুই ভোগ করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি তাহাদিগকে সে সুযোগ মোটেই দেওয়া না হয়, তাহা হইলে অনেকে বিনা কারণে অনেক অপরাধ (Crime) করিতে পারে। তাহাদের সেইরূপ মনের ভাব (Criminal temperament) দূর করিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। এই মেশিনের ন্যায় শোষণে তাহারা তাহাদের সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না।

দেশের জেলে একটা প্রবাদ আছে যে কোন এক কয়েদীকে রাত্রের পাহারা এবং পরে মেট (Convict overseer) করার পর বাড়ীতে চিঠি লিখিবার সময় লিখিয়াছিল, "খোদা আমাকে হাকিম করিয়াছে, আমার হুকুমে দুশো কয়েদী উঠে-বসে।" এ স্থানের যে জমাদার সে আর সেরূপ কৃত্রিম হাকিম নহে। তাহার ক্ষমতা হাকিমের ন্যায়ই। সে ইচ্ছা করিলে অনেক কিছু করিতে পারে। সামান্য ইঙ্গিতে একজনের জীবন পর্যন্ত নষ্ট করিতে পারে। জমাদার যখন ঘরের বাহির হইয়া পরিদর্শন করিতে যায় তখন সমস্ত লোক ভয়ে কম্পিত হয়। তাহার সে প্রতাপ দেখিলে মনে হয় সে নির্বাসিত নহে। পোষাক-পরিচ্ছদে কয়েদীর চিহ্নমাত্র নাই ; নূতন যাহারা তাহাদের হাতে পড়ে তখন তাহাদের মনে কিছুতেই এই ধারণা হইতে পারে না যে, সে-জমাদার একজন কয়েদী !

একজন কয়েদীকে এরূপ ক্ষমতা দেয় কেন এবং প্রতাপশালী করিয়া

গড়ে কেন ? একথা পাঠকের মনে হইতে পারে। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে। শুধু সকল দায়িত্ব হইতে সরকারকে মুক্ত রাখিবার জন্য আর এই সকল দুর্দান্ত লোকের সংস্পর্শে থাকিলে যে বিপদ, সেই বিপদ হইতে দূরে থাকিয়া কণ্টক দ্বারা কণ্টক মুক্ত করার জন্য। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে কয়েদীকে যখন এরূপ আরাম দেওয়া হয় তখন আর দুঃখ কিসে ? এইরূপ আরাম হাজার লোকের মধ্যে দুই-তিন জনের বেশী পায় না।

হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা

হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রথম ভাগে বলা হইয়াছে। জেলে যতখানি বলিয়াছি বাহিরে তদপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। জমাদারের যেরূপ প্রতাপ বাহিরে এ অবস্থায় তাহারা তাহাদের সম্পূর্ণ শক্তি আত্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয় করিতে ত্রুটি করিবে না। নিরাশ্রয় হিন্দু নাবালক যদি মুসলমান জমাদারের হাতে আসিয়া পড়ে তবে তাহার জীবন বিপদহীন হইতে পারে না। যদি নিজে মানসিক বলে বলবান হয়, কোন দুঃখ-কষ্টে পড়িলেও দমে না, তাহা হইলে তাহার রক্ষা। শতকরা পচানব্বই জন মুসলমান জমাদার। সুতরাং সর্বত্রই হিন্দু নাবালককে এই সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয়।

অসৎ অভিপ্রায়ে প্রথম টাকা-পয়সা, খাবার ও নানারূপ প্রলোভন দেখায়। যদি এই প্রলোভনেই কাহারও ধর্মের মেরুদণ্ড শিথিল হইয়া যায় তাহা হইলে তো জমাদারের পক্ষে সোনায়-সোহাগা। ক্রমে বন্ধুত্ব করিয়া সর্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিনা কাজে রাখিয়া তাহাকে মুগ্ধ করে। পরে হাতের ছোঁয়া জিনিষ তাহাকে গোপনে খাইতে দিলে সে আর অমত করিবার শক্তি পায় না। আর যদি ইহাতেও না হয় তবে হাড়ভাঙ্গা কাজে নিয়োগ করিয়া জব্দ করিতে চেষ্টা করে। এ স্থানে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটা খুব বেশী বলিয়া হিন্দুয়ানীটা খুব প্রবল। এ জন্যই যদি জানিতে পারে যে কেহ মুসলমানের স্পর্শ করা কোন দ্রব্য একবার উদরসাৎ করিয়াছে তাহা হইলে হিন্দুদের নিকট তাহার আদর থাকে না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তখন আর সে কোথাও আশ্রয় পায় না। এই অবস্থা ঘটিলেই মুসলমানগণ সকলে তাহাকে যত্ন করে, বল-ভরসা দেয় এবং তাহাদের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে চেষ্টা করে। এই সময়ে ছেলেদের অবস্থা হয় ধান খেয়েছ মুরগী যাবে কোথায় গোছের। এরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কিছু খাওয়াইয়া হিন্দু মহালে প্রচার করিতে থাকে। নবাগত নাবালকেরা কখন কোন কাজের জন্য কোন অবস্থা যে ঘটিবে

বুঝিতে পারে না। আর তাহাদের এ বয়সে সকল ষড়যন্ত্র ধরিবার ক্ষমতাও হয় না।

এরূপ ঘটনা এ-স্থানে অনেক ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে দেখিয়া নির্বাসিত আর্য-সমাজিগণ তাহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া লইবার চেষ্টা যখন আরম্ভ করিয়াছে তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য-সমাজিগণ বহু পুরাণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুগণকে পুনরায় হিন্দু করিয়া লইতেছে। ইহাদের এ-কার্য যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতে মুসলমানদের অবারিত-দ্বার ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। আমাদের ভাই পরমানন্দ একার্যে হিন্দুগণকে গোপনে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বাহির হইতে যাহারা দণ্ড পাইয়া জেলে আসিয়াছে তাহাদিগকে নানা উপদেশ ও শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাদি পাঠ করিতে দিয়া হিন্দুদের অনেক উপকার করিয়াছেন। এমন কি গোপনে পুস্তক আনাইয়া বাহিরের প্রচার কার্যে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুগণকে স্বধর্ম গ্রহণের কার্য তিনি নিজেও জেলে দুই-চারটা করিয়াছেন। তিনি নিজে আর্য-সমাজের লোক সুতরাং তাঁহার চেষ্টাতে আর্য-সমাজের সমাজ হিসাবে মঙ্গল হউক আর না হউক হিন্দু সমাজের যে একটা আমূল পরিবর্তন হইয়াছে একথা অস্বীকার করা চলে না। বাহিরে ও ভিতরে হিন্দুরা পরোক্ষভাগে সকল রাজনৈতিক নির্বাসিতদের নিকট হইতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য পাইয়াছে।

আইন অনুসারে জেলে অর্থাৎ কয়েদী অবস্থায় কেহ যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে চায় সে কার্যে সরকার সম্মতি দিতে পারে না। ইচ্ছা করিলেই বাধা দিতে পারে। কিন্তু কার্যত তাহা করে না। একজন আঠারো বৎসরের নাবালককে বন্দী করিয়া নিয়া আসিয়াছে আজ তাহার উপর প্রবল জুলুম করিতেছে, তাহার ধর্ম, তাহার নৈতিক চরিত্র নষ্ট করিতেছে কিন্তু সরকার এক্ষেত্রে দুর্বলের সাহায্য মোটেই করে না। এরূপ কোন কথা কর্ণে আসিলেও স্থান দেয় না। কারণ পাঠান ভীতিটা সকলেরই আছে। হাজার হাজার যাবজ্জীবন নির্বাসিত লোকের মধ্যে একটা District officer ও একটা overseer, যদি একটা দল হাতে না রাখে তবেই মুস্কিল। আর যদি আত্মরক্ষা করিতে হয় তবে সকলকে হাতে রাখিলেই সকল দিক রক্ষা পায়। ইহা মনে করিয়াই তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

বিধর্মির শক্তি যতই বাড়ে ততই প্রত্যেকে নিজ ধর্মের মধ্যে কতকগুলি

কঠিন আচার প্রবর্তন করে। যখন মুসলমানগণ ভারতে রাজত্ব করিতেছিল, যখন হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তখন হিন্দুদের মধ্যে এমন কঠোর আচার প্রবর্তিত হইল যে সেগুলি ক্রমে ধর্মের অঙ্গ হইয়া চলিতে লাগিল। তাহা আজও চলিতেছে। এ-স্থানে হিন্দুদের শক্তি নানা কারণে অল্প বলিয়াই তাহারা ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি কঠিন নিয়ম করিয়াছে। তাহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে দুইটি দলের উদ্ভব হইয়াছে। একটি সনাতন হিন্দু অন্যটি আর্য সমাজ। সনাতনিগণ গোঁড়া আর আর্য সমাজিগণ উদার। যাহা হউক একদল কঠোর নিয়ম দ্বারা হিন্দুদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, আবার অন্য দল বন্ধন ছিঁড়িয়া যাহারা চলিয়া যায় উদার ভাব দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইতে চেষ্টা করে। উভয় দলই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিরাশ্রিত হিন্দুদিগকে আশ্রয় দিয়া হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিতেছে। বর্তমানে এই সকল কারণে পাঠান জমাদারদের হিন্দুকে মুসলমান করার রোখটা কম হইয়া আসিয়াছে।

বিভিন্ন-ধর্মীর পর্ব

মানুষ যখন আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া সমাজ মধ্যে বাস করে তখন কালের স্রোতের ন্যায় উৎসব কত গর্বে চলিতে থাকে। দিনেব পর দিন, কালের পর কাল কত আসে কত যায়। সকল আনন্দ উৎসবেই সমাজবাসী একটা পরিবর্তন অনুভব করে এবং এইগুলিই জাতির সভ্যতা ও সজীবতার পরিচায়ক। বাঙ্গালীব দুর্গা পূজা, মারাঠির গণপতি উৎসব, হিন্দুস্থানীর দেওয়ালি-বামলীলা, শিখের নানক-জন্মস্থান উৎসব, মুসলমানের ইদ্-মহরম, খ্রীষ্টানের বড়দিন প্রভৃতি উৎসবে সমস্ত জাতির মধ্যে একটা আনন্দ তরঙ্গ আনিয়া দেয়, সমস্ত শ্রেণী নবীন আনন্দে পুলকিত হইয়া মাতিযা উঠে। মানুষেব প্রকৃতি এইগুলি চায় বলিয়াই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিবিধ প্রকারের পর্বের প্রবর্তন হইয়াছে।

আন্দামানে কয়েদীকে সামাজিক উৎসবের মধ্যে হিন্দুকে দশহরা, দেওয়ালি, মুসলমানের ইদ্ ও বকর-ইদ্, ব্রহ্মদেশীর "তাদিন জোয়ে"* ও "তা জাওমোলার" সময় তাহারাও যে এক সময়ে সমাজবাসী ছিল তাহা তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া হয়। হিন্দুব উৎসবে হিন্দু, মুসলমানেব উৎসবে মুসলমান, ব্রহ্মীর উৎসবে ব্রহ্মীকেই যোগদান করিতে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত বড়দিন ও রাজার জন্মদিন এই দুইটি উৎসব সকলেরই জন্য। জেলে উৎসবেব কোনই লক্ষণ নাই, শুধু সে সকল দিনে কাজ করিতে হয় না। বাহিরে আমোদ-স্ফূর্তি সবই করিতে পারে। মানুষের মনে যদি স্ফূর্তি না থাকে তবে আজীবন তাহাকে দুঃখী হইয়াই থাকিতে হয়। এই সকল পর্ব উপলক্ষে তাহারা তাহাদের শুষ্ক জীবন-মরুর মধ্যে কিঞ্চিৎ বারিধারা পতিত হওয়াতে একদিন আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকে। অনেকে বহু বৎসরাবধি সমাজ হইতে দূরে। সামাজিক আনন্দ-উৎসব কখনও তাহারা ভোগ করিতে বা কখন যে কোন উৎসব কোন ফাঁকে চলিয়া যায় তাহা পর্যন্তও জানিতে পারে না।

---

* আমাদের লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন হইয়া থাকে। এই দিবসে বুদ্ধকে স্বর্গ হইতে আসিবার সময় অভ্যর্থনা করে। এবং সমস্ত পেগোডা দীপালোকে সুসজ্জিত করে।

এই স্থানে উৎসব উপলক্ষে নাচ-গানটা বেশী হইয়া থাকে। পূজা-পার্বনের কোন সুযোগ নাই। এক একটা কেন্দ্রে সমস্ত দিন নৃত্য-গীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরাই নৃত্য ভাল জানে, তাহাদের নৃত্যে বেশ একটা art আছে। শরীরের অঙ্গগুলি অতি সহজে এমন ভাবে সঞ্চালন করে যেন অঙ্গের সমস্ত অংশগুলি শুধু মাংস দ্বারা তৈয়ারী। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গেই পরস্পরের হাত ধরিয়া নৃত্য করে, দেখিতে বড়ই সুন্দর, দেহের নিম্নভাগের এমন দ্রুত চালনা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত হেলাইয়া-দুলাইয়া এমন একটা দৃশ্যের সৃষ্টি করে দেখিলে মনে হয় জাতটাই বোধহয় কলাবিদ্যায় বস্তুতই উন্নত। ইংরেজদের, সাঁওতালদের, মাদ্রাজীদের, পাহাড়িয়া কোন কোন জাতের এবং আমাদের বাঙ্গালীর নৃত্য দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে ব্রহ্মীদের নৃত্যকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এ-স্থানের সকল উৎসবের মধ্যে ব্রহ্মীদের উৎসবেই আমোদটা বেশী হইয়া থাকে।

যাহাদের নিকট টাকা-পয়সা আছে তাহারা উৎসবের বা ছুটির দিনে ভাল আহারের বন্দোবস্ত করে এবং দুই-চার জন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করায়। মানুষ যে স্থানেই থাকুক না কেন বন্ধু-বান্ধবের সৃষ্টি করিয়া একটা সামাজিক প্রথার প্রবর্তন করে। এই নির্বাসিতের দেশে বন্ধু-বান্ধব হয় কাহারা; যাহারা দেশ হইতে আসিয়াছে তাহাকে বলে চালানী, আর যাহারা এক জিলা বা প্রদেশের লোক তাহারা মুল্লুকী। এই দুইটি ধারার মধ্যেই আমরা আত্মীয়তা করিয়া লইতাম। চালানী ও মুল্লুকী এই দুইটি কথার মধ্যে কি যে নিহিত আছে বলিতে পারি না, কিন্তু বস্তুতই যাহাদের সঙ্গে একত্র সাগর পার হইয়া আসিয়াছি তাহাদিগকে দেখিলেই আপনার বলিয়া, আর বাঙ্গালী দেখিলেও তাহাই মনে হইত। ইহা যে কেবল আমাদেরই মনে হইত তাহা নহে। দেখিয়াছি এ-স্থানের সকলের মনেই এরূপ ভাব আছে। দুইজন অজানা নির্বাসিতের দেখা হইলেই পরস্পরে জানিতে চায় এক প্রদেশের লোক কিনা, দ্বিতীয়তঃ জানিতে চেষ্টা করে এক সঙ্গে এ-স্থানে আসিয়াছে কিনা। যদি দুইটাই মিলিয়া গেল তবে, সোনায়-সোহাগা। তখন উভয়েরই মনে একটা আত্মীয়তার ভাব জাগিয়া থাকে এবং একে অন্যের সুখ-সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায়। চালানী হইলে খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হয় না। সকল কয়েদীরই ক্রমিক নম্বর থাকে, কাছাকাছি নম্বর হইলেই বুঝিতে হইবে চালানী। চালানীর উপর চালানীর দাবী যতখানি চলে, অন্য কাহারও উপর ততখানি

চলে না। একজন অন্যজনকে সম্বোধন করিতে চালানী ও মুল্লুকী বলিয়া সম্বোধন করে। রস হাসপাতালে আমার পাঁচ-সাত জন চালানী আত্মীয় ছিল। একজন চৌকায় (পাকশালায়) এবং একজন জলের কাজে ছিল। চালানী বলিয়া আমি ইহাদের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাহারা আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছে নচেৎ আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। আমারও ঔষধাদি দ্বারা তাহাদিগকে অজাচিত ভাবে সাহায্য করিতে একটা প্রবৃত্তি হইত। পর্ব উপলক্ষে এই সম্বন্ধের উপরই ভিত্তিস্থাপন করিয়া আমরা সামাজিক বন্ধনের আনন্দ অনুভব করিতাম। এই সকল আনন্দের মধ্যেও অনেক নিরানন্দের সৃষ্টি হইত। উৎসব উপলক্ষে জুয়া খেলাটার ধুমধাম খুব চলে এবং ইহা লইয়াই ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এই স্থানে যে সকল প্রকৃতির লোক আসে তাহাদের দ্বারা আনন্দের মধ্যে নিরানন্দের সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে। ভালমন্দ মিশ্রিত হইলেও মোটের উপর পরিবর্তনের আনন্দ সকলেই কিছু কিছু ভোগ করিয়া থাকে।

ভাইপার, চাটাম, ফিনিক্স এই তিনটি স্থানে তিনটা বড় কারখানা আছে। ভাইপারে কাষ্ঠ, পিতল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কচ্ছপের খোলার কারুকার্যময় বিবিধ প্রকার শিল্পদ্রব্য ; চাটাম কারখানায় কাঠের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি ; ফিনিক্স বেতে-লোহার কল, জাহাজ মেরামতের উপকরণ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ভাইপার কারখানাতে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরাই কাজ করে। তাহাদের মধ্যে অনেক শিল্প বিদ্যায় অভিজ্ঞ লোক আছে। তাহারা যে এ-স্থানে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে। উহাদের শিক্ষা দেশেই। এই স্থানে বহু মূল্যবান জিনিষও প্রস্তুত হয়। সেই সকল জিনিষ এখানে অতি অল্প মূল্যে বিক্রী হয় বলিয়া দুষ্প্রাপ্য বস্তু যে যত পারে ততই ক্রয় করে। আবার কেহ বা ব্যবসাও করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিদেশে বিক্রী করার চেষ্টা অনেকেই করে। এই জন্য স্থানীয় সরকার একটা নিয়ম করিয়া দিয়াছে যে, বেতন অনুসারে মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না। তাহা হইলেও উৎকোচের সাহায্যে অনেক সময় গোপন পথে কাজ চলে। আমাদের অশুতোষ লাহিড়ী এই স্থানে Head writer এবং নিকুঞ্জ বিহারী পাল একজন watch মেরামতকারী ছিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে কারখানার সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে তাহার একবার ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। আশুবাবুকে না জানাইয়া কোন কাজই চলে না ; তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়া গোপনে কাজ করার চেষ্টা সে করে ; এই অন্যায় কাজে বাধা দেওয়াই ঝগড়ার কারণ। তাহাকে রাজনৈতিক কয়েদী বলিয়া জানিলেও একেবারে বেপরোয়া মাথাভাঙ্গা যে আমাদের লোকেরা হইতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না। অবশেষে আশুবাবু এক দিবস District officer-এর সঙ্গে দেখা করিয়া ঝগড়ার কথা বলে, তাহার পর আর আশুবাবুকে কষ্ট পাইতে হয় নাই।

চলে না। একজন অন্যজনকে সম্বোধন করিতে চালানী ও মুল্লুকী বলিয়া সম্বোধন করে। রস হাসপাতালে আমার পাঁচ-সাত জন চালানী আত্মীয় ছিল। একজন চৌকায় (পাকশালায়) এবং একজন জলের কাজে ছিল। চালানী বলিয়া আমি ইহাদের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাহারা আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছে নচেৎ আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। আমারও ঔষধাদি দ্বারা তাহাদিগকে অজাচিত ভাবে সাহায্য করিতে একটা প্রবৃত্তি হইত। পর্ব উপলক্ষে এই সম্বন্ধের উপরই ভীত্তিস্থাপন করিয়া আমরা সামাজিক বন্ধনের আনন্দ অনুভব করিতাম। এই সকল আনন্দের মধ্যেও অনেক নিরানন্দের সৃষ্টি হইত। উৎসব উপলক্ষে জুয়া খেলাটার ধুমধাম খুব চলে এবং ইহা লইয়াই ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এই স্থানে যে সকল প্রকৃতির লোক আসে তাহাদের দ্বারা আনন্দের মধ্যে নিরানন্দের সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে। ভালমন্দ মিশ্রিত হইলেও মোটের উপর পরিবর্তনের আনন্দ সকলেই কিছু কিছু ভোগ করিয়া থাকে।

ভাইপার, চাটাম, ফিনিক্স এই তিনটি স্থানে তিনটা বড় কারখানা আছে। ভাইপারে কাষ্ঠ, পিতল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কচ্ছপের খোলার কারুকার্যময় বিবিধ প্রকার শিল্পদ্রব্য ; চাটাম কারখানায় কাঠের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি ; ফিনিক্স বেতে-লোহার কল, জাহাজ মেরামতের উপকরণ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ভাইপার কারখানাতে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরাই কাজ করে। তাহাদের মধ্যে অনেক শিল্প বিদ্যায় অভিজ্ঞ লোক আছে। তাহারা যে এ-স্থানে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে। উহাদের শিক্ষা দেশেই। এই স্থানে বহু মূল্যবান জিনিষও প্রস্তুত হয়। সেই সকল জিনিষ এখানে অতি অল্প মূল্যে বিক্রী হয় বলিয়া দুষ্প্রাপ্য বস্তু যে যত পারে ততই ক্রয় করে। আবার কেহ বা ব্যবসাও করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিদেশে বিক্রী করার চেষ্টা অনেকেই করে। এই জন্য স্থানীয় সরকার একটা নিয়ম করিয়া দিয়াছে যে, বেতন অনুসারে মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না। তাহা হইলেও উৎকোচের সাহায্যে অনেক সময় গোপন পথে কাজ চলে। আমাদের অশুতোষ লাহিড়ী এই স্থানে Head writer এবং নিকুঞ্জ বিহারী পাল একজন watch মেরামতকারী ছিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে কারখানার সুপারিনটেণ্ডেন্টের সঙ্গে তাহার একবার ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। আশুবাবুকে না জানাইয়া কোন কাজই চলে না ; তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়া গোপনে কাজ করার চেষ্টা সে করে ; এই অন্যায় কাজে বাধা দেওয়াই ঝগড়ার কারণ। তাহাকে রাজনৈতিক কয়েদী বলিয়া জানিলেও একেবারে বেপরোয়া মাথাভাঙ্গা যে আমাদের লোকেরা হইতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না। অবশেষে আশুবাবু এক দিবস District officer-এর সঙ্গে দেখা করিয়া ঝগড়ার কথা বলে, তাহার পর আর আশুবাবুকে কষ্ট পাইতে হয় নাই।

এ-স্থানে খুব মূল্যবান শিল্পকার্য কচ্ছপের খোলের তৈয়ারী নানারূপ জিনিষ। চিরুণী, ছোট ছোট গহনার বাক্স, সাহেবদের ব্যবহারের যোগ্য নানারকম দ্রব্যাদি, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিতলের সুন্দর সুন্দর ব্যবহারের যোগ্য অলঙ্কার এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। আন্দামানের মধ্যে এই কারখানার শিল্পদ্রব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন কোন বিষয়ে ইহার তুলনা ব্রিটিশ রাজ্যের কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি হইত তবে বাজারে সেইরূপ দ্রব্য দেখা যাইত। জগতের কোথাও এরূপ কচ্ছপের খোলের কাজ আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে কোকেন, আফিম বা revolver প্রভৃতির লাইসেন্স ব্যতীত কাহারও নিকট সে সকল দ্রব্য পাইলে যেমন অপরাধ এ-স্থানে কচ্ছপের খোসা সম্বন্ধে আইনের জুলুম তদপেক্ষা অধিক। কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তির নিকট উহা পাইলে জেল অনিবার্য। ইহার লাইসেন্স পর্যন্ত কাহাকেও দেওয়া হয় না। ইহা দ্বারা প্রস্তুত জিনিষগুলি এত সুন্দর যে বলিয়া বুঝান যায় না। মোটের উপর ইহা জগতের আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। এ-স্থান হইতে যাহা প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই বিলাতে যায় কারণ সাহেবদের বেতন বেশী, কাজে কাজেই তাহারা বেশী পরিমাণ তৈয়ার করাইতে পারে।

চাটামে নানারূপ কাষ্ঠের কারুকার্যখচিত ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আন্দামানের প্রধান আয় কাষ্ঠ হইতেই হইয়া থাকে। এ-স্থানের খরচ বৎসরে বিশ লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে তিন লক্ষ টাকা এই জঙ্গল কাজ অর্থাৎ কাঠের কাজ হইতে আসে। এ-স্থানের সকল খরচ এ-স্থানের আয় দ্বারা চলে না। বৎসরে দশ লক্ষ টাকা স্থানীয় গভর্নমেণ্টকে ভারত গভর্নমেণ্ট হইতে আনিতে হয়। চাটামের কাঠের কারখানায় অনেক কাজ মেশিনের দ্বারা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশী লোকেরাই সর্বপ্রকার কাজের তত্ত্বাবধায়ক। ব্রহ্মদেশী লোকেরা যে সকল কারুকার্য করে তাহার সঙ্গে আমাদের অতীত যুগের শিল্প বিদ্যার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সকল কার্য আমাদের সভ্যতা যে এক ছিল তাহার প্রমাণ করে। ব্রহ্মদেশী লোকের মধ্যে জাত বিচার বা বর্ণ বিচার নাই। তাহারা সকলেই এক জাত। সুতরাং কাহাকেও অমুক জাত, অমুক শ্রেণী, অমুক কাজ করিয়া দিবে এ আশায় বসিয়া থাকিতে হয় না। এরূপ সামাজিক নিয়ম আছে বলিয়াই তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় সর্ববিধ কাজে অভিজ্ঞ। কাঠের কাজ সম্বন্ধে দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে সকলেই জানে। সামাজিক এরূপ

প্রথার গুণেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। ব্রহ্মদেশী লোক এ-স্থানে না থাকিলে আয়ের পথ অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিত। এ-স্থানে কমের পক্ষে কারখানায় ছয়-সাত শত লোক দৈনিক কাজ করে।

ফিনিক্স বেতে-লোহার একটা কারখানা আছে, এ-স্থানে লোহার ঢালাই করা বিবিধ প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল প্রকার কার্যের মধ্যে লোহার Hand oil mills ভালরূপ তৈয়ার করে। নানারূপ কল (machine) মেরামত, জাহাজ (Boiler) প্রভৃতি মেরামত এ-স্থানের কারখানার সাহায্যে ভালরূপ হইয়া থাকে। এ-স্হানেও ব্রহ্মদেশী লোকই প্রধান কার্যকারক। যে কোন স্হানে, যে কোন মূল্যবান কাজ হয়, সেই স্হানেই ব্রহ্মী। লোহার কোন কাজ বা মেরামতের জন্য স্থানীয় গভর্নমেণ্টকে কোথাও যাইতে হয় না। সকল প্রকার কার্যই এ কারখানার সাহায্যে হইতে পারে।

গভর্নমেণ্ট শৈলাবাস

ভারতে যত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই ঋতু পরিবর্তনের জন্য যেমন একটি করিয়া স্থান থাকে সেইরূপ এই স্থানীয় গভর্নমেণ্টেরও একটি গ্রীষ্মাবাস আছে। সাগরের মাঝে জেল হইতে প্রায় ছয়-সাত মাইল উত্তরে এই স্থানটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই পাহাড়টি সকল পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ। আন্দামানে শীত-গ্রীষ্ম কোনটারই আধিক্য নাই। জঙ্গল টাপুর কোন কোন স্থানে অল্প সময়ের জন্য গ্রীষ্ম ঋতু দেখা দেয়। আর এই শৈলাবাসের পাহাড়ে অল্প দিনের জন্য সামান্য শীত ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। আমরা যে সকল স্থানে ছিলাম তাহার মধ্যে কোথাও শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর আধিক্য দেখি নাই। চিরকালই এক কম্বলে কাটাইয়াছি। তথাপি একটা শৈলাবাস রাখা চাই, নচেৎ চাল বজায় থাকে না।

রস্ দ্বীপের জলবায়ু যেমন ভাল এ-স্থানের জলবায়ুও তেমনই। এ-স্থানের পানীয় জলটা রস্ দ্বীপ অপেক্ষাও ভাল। Government House-এ প্রত্যহ নৌকা যোগে এ-স্থান হইতে পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই জলটা ঝরণা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া পাহাড়ের নীচে আসে, তাহা হইতেই পানের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

পাহাড়টি খুব ক্ষুদ্র, তাহারই ঠিক অগ্রভাগে গভর্নমেণ্টের একটি বাঙ্গালা আছে। এই বাঙ্গালা বহু দূর হইতে দৃষ্টি পথে পড়ে এবং এই স্থান হইতে চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দ্বীপের কোথাও কোন লোক বাস করিতে পারে না। বাঙ্গালায় যাইবার রাস্তা মাত্র একটি, সে পথও আবার পুলিশ প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত।

এ-স্থানে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরিজীবী হইয়াছে। যে সকল কয়েদী পূর্বে টিকেট লিভ হইয়া বিবাহ করিয়া এ-স্থানে সন্তান-সন্ততিসহ ঘর সংসার করিতেছিল, তাহারাই বর্তমান লোকদের পূর্বপুরুষ। যাহারা এ-স্থানে বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন করে মুসলমান না হইলে দেশের সমাজে তাহাদের স্থান হয় না ; সুতরাং তাহারা এ-স্থানেই বসবাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। টিকেট লিভদিগের দণ্ডের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাহারা এ-স্থানেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান করিতে রাজি কিনা। যাহারা থাকিতে ইচ্ছুক হয় তাহারাই এই শ্রেণীর লোক। ক্রমে এইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট ইহাদের উন্নতির জন্য একটি হাই স্কুল করিয়া দিয়াছে এবং সেই স্থান হইতে পাশ করিলেই তাহাদিগকে কাজকর্ম দিয়া সাহায্য করিতে চেষ্টা করে।

অতি জঘন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই শ্রেণীর উদ্ভব বলিয়া নৈতিক চরিত্র বলে তাহারা অত্যন্ত হীন। স্ত্রীলোকের বেশ স্বাধীনতা আছে, তাহারা ঐ সকল দোষে দোষী হইলে বেশী নিন্দনীয় নহে। কারণ কোন ঘরেই বিশুদ্ধতা নাই। অতি অল্প বয়সের ছেলেগুলির চোখে-মুখে কথা ফুটে। ঐ বয়সের ছেলেগুলির মুখের কথা পাকা লোকের ন্যায়। আকারও আবার তেমনি। দশ-বারো বৎসরের সন্তান-সন্ততিগুলিকে আমাদের দেশের ছয়-সাত বৎসরের ছেলেমেয়েদের ন্যায় দেখায়। শরীরে মাংস নাই শুধু কয়েকখানা হাড় আছে মাত্র। সভ্যতার হিসাবে স্থানীয় জঙ্গলীদিগকেও হার মানিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণী চাকুরিজীবী অন্য শ্রেণী কৃষি ও ব্যবসাজীবী। ব্যবসা খুব কম লোকেই করে তাহার কারণ অর্থাভাব। যাহারা কৃষিজীবী তাহারা সামান্য চাষ-আবাদ করে আর দুগ্ধবতী গাভী রাখিয়া দুগ্ধ বিক্রী করে। দুগ্ধের ব্যবসাটা খুব লাভের। এ-স্থানে কয়েদীদের হাসপাতালের জন্য অনেক দুগ্ধের প্রয়োজন। যতটা

দৈনিক আবশ্যক অনেক সময় তাহা জোটান কঠিন হইয়া উঠে। সে জন্যই মূল্যটাও বেশীই থাকে। অনেকে শুধু দুগ্ধেরই ব্যবসা করে। যাহারা একটু সভ্যতার আলোক পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছেলেদিগকে কলিকাতা ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখাইতে পাঠাইয়া থাকে। ইহা Burma Government-এর অধীন বলিয়া রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা লোকদিগকে একটু বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। যতই চেষ্টা করুক না কেন, বাল্যকালের সমাজ শিক্ষার দোষেই সব মাটি করিয়া দেয়। সমস্ত আন্দামানের মধ্যে মাত্র একটি B.A পাস লোক। ইনিই হাই স্কুলের হেড মাষ্টার। বি.এ পাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার চরিত্র-ইতিহাস শুনিলে কর্ণবিবরে অঙ্গুলী দিতে ইচ্ছা হয়। শুধু যদি তাহার নিজেরই হইত ক্ষতি ছিল না, উভয় দিকেই! স্থানীয় লোকদের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কিছু আছে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত উল্লেখ করা যায় না। মাতাপিতার দোষ-গুণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানও পাইয়া থাকে। এই সমাজে ভাল বলিবার কিছুই নাই সুতরাং ভবিষ্যৎ বংশধর কি অবলম্বনে ভাল হইবে? এই সকল দোষের জন্যই উপদংশ রোগহীন লোক এই সমাজে একটিও মিলে না।

মন ভুলান প্রচেষ্টা

আন্দামান উঠাইয়া দিবার আন্দোলন যতই প্রবল হইয়া উঠিল এবং India Government-এরও যখন অনেকটা সম্মতি জানা গেল তখন স্থানীয় সরকার প্রজা রঞ্জনের জন্য নির্বাসিতগণের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রাচীন নিয়মগুলি পরিবর্তন করিয়া অনেকটা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিল। নির্বাসিতের প্রাণ, যাহারা সুখ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত, যাহারা সমাজ ও সংসারের আশা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে জন্মভূমির মুখদর্শন করিবে বলিয়া যাহারা আশা রাখে না, মরুভূমির তৃষিত চাতকের ন্যায় যাহারা জীবন-যাপন করিতেছে তাহারা অতি সামান্য আনন্দের আস্বাদেই যে আত্মহারা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জীব মাত্রেই সুখের প্রত্যাশী, এই সুখের জন্য আজীবন জীব সংগ্রাম করিতেছে, এই সুখেরই পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া কত লোক কত প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত, বিপদাপন্ন ও সর্বস্বান্ত যে হইতেছে তাহার গণনা নাই। বার বার সুখের আশায় দুঃখ ভোগেও নিরত হইতেছে না, প্রতিবারে বিফল হইয়াও আশা ছাড়িতেছে না, জীবনদানেও আশাই মানুষকে বড় করে, আবার আশাই জীবনকে বিপদাপন্ন করে। অনেক ক্ষেত্রে আশু সামান্য সুখের আশায় ভবিষ্যতের অধিক সুখকে বিসর্জন দিয়া থাকে।

সরকার মানব মনোবিজ্ঞান বা নির্বাসিত মনোবিজ্ঞান ভালরূপ জানে বলিয়াই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে তাহার আটকায় না। পূর্বে বেতনের নিয়ম ছিল পাঁচ বৎসর অন্তর, সে স্থানে করিল তিন বৎসর, টিকেট লিভের ব্যবস্থা করিল সাত বৎসর অন্তর, শক্ত কাজের স্থলে করিল সহজ কাজ, বিকালের অশান্তিতে সময় কাটার পরিবর্তে ফুটবল খেলা, ডাণ্ডার পরিবর্তে হাতবুলান, বুটের পরিবর্তে মিষ্টি কথা, মুক্তির ব্যবস্থা করিল অনন্তকালের পরিবর্তে চোদ্দ বৎসর অন্তর, বিবাহের নিয়মের পরিবর্তে করিল দেশ হইতে আপন স্ত্রীকে আনার ব্যবস্থা। হাতে চাঁদ পাওয়ার মত নির্বাসিতগণ হঠাৎ ঐরূপ আশাতীত সুযোগ-বাণী সরকারের মুখে শুনিয়া অতীতের সকল গ্লানি, সকল মর্মবেদনার কথা ভুলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল। প্রথম

প্রথম লোকের মনে এ কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই। যখন এইগুলি কার্যত প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিল তখন তাহাদের অবিশ্বাস নষ্ট হইল।

এই ব্যবস্থা করার প্রধান উদ্দেশ্য কয়েদীর মুখ হইতে বাহির করা যে তাহারা এ-স্থান ছাড়িয়া দেশের জেলে যাইতে অনিচ্ছুক। প্রথম এই সম্বন্ধে প্রচার করিয়া পরে Hon'ble Mr. Guyne (Home member)-কে এ-স্থানে আনা হয়। সে এ-স্থানে আসিয়া পূর্বের কয়েদী মনোভাবের অনেক পরিবর্তন দেখিতে পায়। যে সকল কয়েদী এককালে দেশের জেলে যাইবার জন্য উন্মাদ ছিল, এখন আর তাহাদের সে ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা-অনিচ্ছা দুই প্রকার কথাই কয়েদীর মুখ হইতে শুনিতে পাইল। ইংরাজ যে কূটনীতিতে সকলের সেরা ইহা জগতের সকল জাতিই জানে এবং সকলেই তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। সেই নীতি অবলম্বনেই এ-স্থানের অবস্থার এমন উল্টাপাল্টা করিয়া দিল যে আন্দামান উঠাইয়া দিবার আন্দোলনকারীকে পরে পরাভূত হইতে হইল। তথাপি আমরা এই মাকালের ভবিষ্যৎ অপকারিতা বুঝাইতে ত্রুটি করিলাম না। আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে যাহা করা সম্ভব তাহা করিতে লাগিলাম। কিন্তু করিলে কি হইবে। আমরা বন্দী; আমাদের সম্বল কেবল মুখ। আমরা আশু-ফল দেখাইতে পারি না। সরকারের ফল কয়েদীরা হাতে হাতে পাইতে লাগিল; এ অবস্থায় তাহাদের আশার গতি রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের রহিল না।

প্রথম অবস্থায় আতুর খোঁড়া ও রুগ্ন লোকদিগকে দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিল; বহু লোককে চোদ্দ বৎসরের মধ্যেই মুক্তি দিতে লাগিল; আবার যাহাদের মুক্তি চিরকালের জন্য বন্ধ রাখিয়াছিল, তাহারাও মুক্তি পাইতে বাদ পড়িলাম না। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল মুক্তি শতকরা দুই-চার জন লোকেই পায়, আর বাকী যাহারা থাকে তাহার মধ্যে নব্বই জন মরে এবং অবশিষ্ট সব চির নির্বাসিত থাকে।

ইহা দেখিয়া সকলে আশামুগ্ধ হইল। তাহারা আজও সেই আশার পিছনেই ধাবিত হইতেছে। কিন্তু এই প্রকৃতির রাজ্যে আশু প্রসবকারী জীব বা বৃক্ষের জীবন যে ক্ষণস্থায়ী হয় সে জ্ঞান ইহাদের নাই। তাহা হইলে কেহ এই মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইত না। আমাদের ধারণা এ অবস্থা সরকার বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত রাখিতে পারিবে না। তাহার কারণ এ নিয়ম অনুসারে কয়েদীকে সুখ-সুবিধা দিলে সরকারের নিত্য

আবশ্যকীয় স্থানীয় শ্রমের কাজই চলিবে না। পরে তাহাকে বাধ্য হইয়া আবার পূর্বের অবস্থায় যাইতে হইবে এবং পূর্ব নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। শুনিতে পাই রাজনৈতিক বন্দীরা জেল হইতে বাহিরে ও দেশের বিভিন্ন জেলে বদলি হওয়ার পর অল্প দিনের মধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষ আবার পূর্ব নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে। এ কথা আমরা স্পষ্ট ভাবে জানি বলিয়াই আগাগোড়া বলিয়া আসিয়াছি যে এ-স্থানের যতই পরিবর্তন হউক না কেন, সৃষ্টির কাল হইতে এ-স্থানের যে গলদ আছে তাহা কিছুতেই মুছিয়া যাইবে না।

চির সুখ-সুবিধা বঞ্চিত নির্বাসিতগণ সরকারের কথায় মুগ্ধ যাহাতে না হয় সে চেষ্টা আমরা করিয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টার ফলে যাহারা দেশে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু উপকার পাইয়াছে। আমাদের মধ্যে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের অনেকেই অনেক মাপ* পাইয়াছে। আমি নিজেও অনেক মাপ পাইয়াছি। যদি আন্দামানে শেষ পর্যন্ত থাকিতাম তাহা হইলে এক দিনও ভাগ্যে ঘটিত না। কারণ এ-স্থানে Remission system নাই। এ-স্থানে যাহারা লোভে ভুলিয়াছে তাহারাই ভুল করিয়াছে।

* Remission.

নারিকেল বৃক্ষ

আন্দামানে কত লক্ষ নারিকেল যে বৎসরে উৎপন্ন হয় তাহার কোন হিসাব-নিকাশ নাই। নারিকেলের হিসাব-নিকাশ থাকা দূরের কথা, নারিকেল বৃক্ষের পর্যন্ত ঠিক হিসাব-নিকাশ নাই। পূর্বে বলিয়াছি এই স্থানে প্রধান আয় কাষ্ঠের ; তাহার পরেই নারিকেলের। এই নারিকেল দ্বারা কিরূপে আয় হয় তাহাই বলিতেছি। নারিকেল শাঁস শুকাইয়া তাহা দ্বারা তৈল তৈয়ার করা হয়। অবশিষ্ট যে খৈল থাকে তাহা গরুর খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার নারিকেলের যে খোসা থাকে তাহা হইতে তার বাহির করে, সেই তার হইতে পাতলা-মোটা নানারূপ রশি, গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আবার তার বাহির করিবার সময় যে ভূষি বাহির হয় তাহা চা-বাগানে সারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। গাছের পাতার মাঝখানে যে শিরদাঁড় থাকে তাহা দ্বারা ঝাঁটা তৈয়ার হইয়া থাকে। নারিকেলের খোল কলিকাতাতে হুকার জন্য প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল নারিকেলের খোল হুকার উপযুক্ত নহে তাহা জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য ব্যবহার হয়।

আমরা নারিকেলের শাঁসটুকু রাখিয়া বাকী সমস্ত জিনিষটা বৃথা নষ্ট করি। কিন্তু শাঁসের সম মূল্যবান যে তাহার আরও অনেক জিনিষ আছে তাহা আমাদের দেশের লোকেরা জানে না। নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে নারিকেল যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই সামান্য মূল্যে বিক্রি বা বৃথা নষ্ট হয়। সেই স্থানে নারিকেল তৈল, নারিকেল ছোবার রশি প্রভৃতি অল্প খরচায় প্রস্তুত হইতে পারে। নারিকেল তৈল আমাদের দেশে যথেষ্ট এ-স্থান হইতেই রপ্তানী হয়। নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে হাত-কুলু (Hand oil mills) বসাইয়া যদি কেহ ব্যবসা আরম্ভ করে তাহা হইলে সমস্ত বাংলা দেশকে তৈল জোগাইয়া অন্য দেশে পর্যন্ত রপ্তানী করিতে পারে। আমাদের দেশে সরিষার ঘানী আছে, সেই সকল ঘানীতেও নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। নারিকেলগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই চলে, ইহার অন্য কোন হাঙ্গামা নাই। তার সম্বন্ধে

পূর্বে যে প্রণালী বলা হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করা যাইতে পারে। গ্রামে অনেক লোক কাজের অভাবে বসিয়া থাকে, যদি এই সকল ব্যবসার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে দেশের শ্রমিকদেরও অনেক উপকার হইতে পারে। এ-স্থানে নারিকেল সম্বন্ধে এইটুকু এই উদ্দেশ্যে লিখিলাম যে, যদি কোন নারিকেল প্রধান দেশের লোক এই সংবাদ পায় তবে তাহারা উহা তাহাদের ব্যবসায় প্রয়োগ করিতে পারিবে।

বাহিরে রাজনৈতিক বন্দী

প্রথম আমরা যে চারিজন বাহির হই, এই সংবাদ পাঠকগণের মনে আছে। ইহার পর ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন বাহির হয়। যাহারা পরে দীর্ঘকাল লৌহ নিগড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরের হাওয়া পাইল, তাহাদের নাম নিম্নে দিলাম।

শ্রীগোবিন্দ চরণ কর, শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী পাল, শ্রীঅমৃতলাল হাজরা, ভাই শের সিং, শ্রীপরমানন্দ, শ্রীচত্তর সিং, শ্রীকেশর সিং, শ্রীবিশন সিং, শ্রীফের সিং, পণ্ডিত জগৎ রাম, শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীসানুকুল চ্যাটার্জি, শ্রীসত্যরঞ্জন বসু, লালা রামশরণ, মাষ্টার কৃপারাম। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা জেলে কাজ করিতেন তাঁহারা বাহিরে একত্র বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলকে বিভিন্ন স্থানে একা একা পাঠায়। কোন দুই জন লোককে এক সঙ্গে রাখে নাই। ভাইপার দ্বীপে যাহারা বাস করিতেন তাঁহারা কেবল তিন জন পরস্পরে দেখা করিতে পারিতেন। তাঁহাদের কাজকর্ম সকলেরই হালকা ছিল। অমৃতলাল হাজরা, নিকুঞ্জ বিহারী পাল ও আমার কাজই সকলের কাজ অপেক্ষা শক্ত ছিল। পূর্বে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। পুরাণ দলের সকলকেই বাহিরে দিয়াছে একথা বলিয়াছি, কিন্তু তাহা নহে। শ্রীযুক্ত গণেশ দামোদর সাভারকর, শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর, শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস এই তিন জনকে কখনও বাহিরে দেয় নাই, তাঁহারা যতদিন আন্দামানে ছিল ততদিন জেলেই কাটাইয়াছে। এদের উপর সরকারের খুব কড়া নজর ছিল। ইহার উপর পুলিনবাবুর প্রতি একটু অধিক ছিল। India Government-এর আদেশ অনুসারে সকলেই কিছু কিছু সুবিধা পাইয়াছে, কিন্তু পুলিনবাবু তাহার কিছুই পাইবেন না বলিয়া সরকারের আদেশ। ব্যাড়ির রাজ্যে সে ষোল আনার স্থলে সাড়ে ষোল আনা আদায় করিয়া লইতে ত্রুটি করে না। ব্যাড়ি সাহেব বোধহয় "অধিকন্তু ন দোষায়" নীতি খুব ভাল রূপ জানে, সে জন্যই সে উপরের আদেশ যতখানি থাকে তদপেক্ষা একটু বেশী করিয়া কড়াকড়ি করে।

মাটি কাটা কাজ

পূর্বে বলা হইয়াছে এ-স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও টিলায় পূর্ণ। অতি পূর্বকালে কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে এই সকল স্থান লোকবাসের যোগ্য ছিল বলিয়া বর্তমান অবস্থা দেখিলেও মনে হয় না। এই স্থানগুলি লোকের বাসের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য বহু নির্বাসিত রক্ত ও জীবন-পাত করিয়াছে। উঁচু-নীচু স্থানগুলিকে সমতল না করা পর্যন্ত সভ্য লোকের বাসের অনুপযুক্ত ছিল। এইগুলি সমতল করিবার যে কাজ উহাই মাটি কাটা কাজ। অর্থাৎ পাহাড় কাটা কাজ।

অতি উচ্চ উচ্চ টিলাগুলি কাটিয়া নিম্ন স্থলগুলিকে মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া এ-স্থানে অনেক সমতল ভূমি তৈয়ার করিয়াছে। এ কাজ অত্যন্ত শক্ত। সাধারণতঃ লোকের শুধু পাহাড় বাহিয়া চলাই শক্ত ; ইহার উপর যদি আবার মাটির বোঝা নিয়া চলা যায় তবে ব্যাপারটা যে কিরূপ হয় তাহা পাঠকগণ অনুমান করিয়া লইবেন। ইহা একবার দুইবার করিলেই যে হইল তাহা নহে, সমস্ত দিনই এভাবে পাহাড় বাহিয়া কাজ করিতে হয়। জেল হইতে যাহারা বাহিরে পাহাড় কাটার কাজে গিয়াছে তাহারা ৬টার সময় বাহির হইয়া ১০টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার ১২টার সময় যাইয়া ৪টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখে শুনিয়াছি এমন স্থানে কাজ করিতে হয় যে প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা। এমন স্থান দিয়া চলা-ফেরা করিতে হয় যে একবার পা ফস্কিয়া গেলেই যে কোথায় গড়াইয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এ-স্থানে জীবনকে যমের হস্তে সমর্পণ করিয়াই চলিতে হয়।

সর্বদা ধূলো-বালিতে লোকগুলির শরীরের বর্ণের এমন অবস্থা হয় যেন চামড়া ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে চায়। মানুষগুলি সম্পূর্ণ বদলিয়া যায়। কাজটা জঙ্গল কাজের ন্যায়ই শক্ত। এ-কাজ যাহারা বহু দিবস করে ক্রমে ক্রমে তাহাদের এক প্রকার স্থায়ী চর্মরোগ হয় তাহার উপর আবার নোনা জল লাগাতে আরও খারাপ হয়। এই পাহাড়-কাটা কাজ করার সময় কত লোকের যে মস্তক ধূলার সঙ্গে মিশিয়া গেছে, কত লোক যে চিরকালের

তরে খোঁড়া হইয়াছে, কত লোক যে একেবারে কাজের বাহির হইয়াছে তাহার খবর কে রাখে? যাহারা ভীষণ ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে তাহাদের কেহ বা হাসপাতালে আবার কেহবা মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে। এই সকল মৃত্যু সবই accidental বলিয়া রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে।

কয়েদী জীবনের কোন মূল্য নাই। এ-স্থানে কয়েদীর সঙ্গে শুধু স্বার্থের সম্বন্ধ। যে স্থানে স্বার্থের সম্ভাবনা নাই সে স্থানে কোন সম্বন্ধ নাই। যাহা দ্বারা যত ভাল কাজ হইতে পারে ততই তাহার আদর। এ-স্থানে ভক্তিশ্রদ্ধার বিনিময়ে যে স্নেহ-ভালবাসা পাইবে তাহার কোন আশা নাই। কয়েদী জীবনের যদি মূল্য থাকিত তবে কাহাকেও এরূপ ভাবে জীবন হারাইতে হইত না।

সমুদ্রের জীব

অল্পদিনই বাহিরে ছিলাম। তাহাতে সীমাবদ্ধ অবস্থায়। যতখানি স্থান নির্দিষ্ট ছিল তাহার বাহিরে এক-পাও বাহির করিবার উপায় নাই। সুতরাং বিশেষ কিছু দেখিতে পারি নাই। পুস্তকে পাঠ করিয়াছি কাঁকড়া ৩৬ প্রকার। এ-স্থানেও সমুদ্রের পারে ভ্রমণ করিতে যাইয়া বহুবিধ কাঁকড়া দেখিয়াছি। নানা রঙের ও লাল আকারের অনেক কাঁকড়া, কড়ি মৎস্য দেখিয়াছি। সমুদ্রের জল যখন হ্রাস হয়, তখন কাঁকড়াগুলি সমুদ্রের ধারে পাথরের গায়ে ফাঁকা ফাঁকা স্থানে লুকাইয়া থাকে। মানুষকে দেখা মাত্রই লাফাইয়া লাফাইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মানুষের পদশব্দ শুনা মাত্রই ভয়ে লুকাইয়া পড়ে। কড়িগুলি জল চলিয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের মধ্যে যে গর্ত থাকে তাহাতে জড় হইয়া থাকে। দেখিলে মনে হয় কেহ যেন কুড়াইয়া রাখিয়াছে। কড়িগুলি আমাদের দেশের বাজারের কাল কড়ার ন্যায় নহে, আকারে বড় ও দেখিতে সুন্দর। আমাদের দেশে একটা কড়ির মূল্য দুই আনা পর্যন্ত হয়। অতি বৃহৎ কড়িও এ-স্থানে পাওয়া যায়। এ-স্থানেই তাহার একটার মূল্য দুই-আড়াই টাকা। দেশে ইহার একটার মূল্য পাঁচ-সাত টাকার কম হয় না। এই জাতীয় নানা আকার ও প্রকারের অনেক মূল্যবান দ্রব্যই এ-স্থানে পাওয়া যায় ইহা পূর্বে বলিয়াছি। ঝিনুক এক একটা এত বড় যে একটাতে এক সের পর্যন্ত জল ধরে।

সমুদ্র মৎস্যের অনেক গল্প অনেকে শুনিয়াছেন। এ-স্থানে চোখে যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিব। অনেক মৎস্য আমাদের দেশের মৎস্যের ন্যায় দেখায় কিন্তু কাটিলে ভিতরে অন্য প্রকার এবং খাইতে ভিন্ন স্বাদ। এক প্রকার মৎস্য আছে দেখিতে আমাদের দেশের রুই মৎস্যের বাচ্চার ন্যায় কিন্তু ভিতরে চিতল মৎস্যের অনুরূপ। আবার এক প্রকার মৎস্য আছে উহারা স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি এমন ভাবে মিলিয়া থাকে যে দেখিলে একটা মৎস্য বলিয়া মনে হয়। অতি সহজে কিছুতেই ধরা যায় না যে দুইটা মৎস্য

এক সঙ্গে জোড়া আছে। উহাদের চক্ষু এক পাশে, একটি অন্য পার্শ্ব সম, মশ্রিন। যে পার্শ্বে চক্ষু নাই সেই পার্শ্বই স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া থাকে। উহাদিগকে পৃথক করিলে প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র মৎস্য। এক প্রকার ক্ষুদ্র চিংড়ি মৎস্য আছে উহারা সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইয়া যখন হ্রাস পাইতে থাকে তখন সমুদ্রপারে সমুদ্র জেনার ন্যায় এদিক-ওদিক হইতে থাকে। এক এক স্থানে টুকরী পরিমাণ জমা হইয়া থাকে। একবারে যতটা উঠাইতে পারা যায় উহাই এক জনের বোঝা। লোকে যখন মৎস্য পায় না তখন ইহাই তাহাদের সম্বল। ভাঁটার সময়ে ইহার অভাব হয় না। যে কোন স্থানে ইহা পাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় টুকরী লইয়া সমুদ্রে গেলেই মিলে। এগুলি হইতে প্রস্তুত হইতে পারে এক ভাজা আর শীল-নোড়ায় পিশিয়া বড়া। এক প্রকার মৎস্য আছে উহারা খুব ছোট আমাদের দেশের পুঁটি মাছের ন্যায়। উহারা জলের বাহির হইয়া শূন্যে উড়িয়া অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে।

এক প্রকারের বড় মটর ডালের অর্ধাংশের ন্যায় জীব আছে। উহা পাথরের ন্যায় কঠিন, মাঝখানে একটু কালো দাগ আছে। এই দাগটুকু যতদিন কাল থাকে, তত দিনই সজীব। আর দাগটা শাদা হইয়া গেলেই মৃত। উহা ক্রমে আকার পরিবর্তন করিয়া অন্য আকার ধারণ করে এবং পরে শঙ্খে পরিণত হয়। এখানেই শঙ্খের ক্রমবিকাশবাদের পরিচয় পাইলাম। এগুলি সমুদ্রের পাড়ে যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকে দেখিলে কাহারও বিশ্বাস হয় না যে ইহার মধ্যে জীবন আছে এবং ইহাই পাঞ্চজন্য শঙ্খের পরবর্তী বংশধর।

আর এক প্রকারের জীব আছে। উহাও দেখিতে উদ্ভিদের ন্যায়। ডাল আছে, পাতা নাই। ডালগুলি বহু শাখা সমন্বিত হরিণের শিং-এর ন্যায়। এইগুলি পরে পাথরের চিপায় জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশে নদীর উপর জঙ্গলা গাছের মধ্যে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, যাহাকে আমরা চিংড়ি মাছের ময়লা বলিয়া থাকি এগুলিও সেইরূপ জিনিষ কিন্তু আকারটা অন্য রূপ। আবার এইগুলি জল হইতে উঠাইয়া শুকাইলে শ্বেত পাথরের ন্যায় দেখায় এবং শক্তও ঠিক পাথরের ন্যায়। এখানে টেবিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য লোকে ব্যবহার করে।

একবার সমুদ্র জল বৃদ্ধি পাইলে একটা জনশূন্য স্থান জলপূর্ণ হয়, সে সঙ্গে একটা বৃহৎ মৎস্য সেই স্থানে যাইয়া আটকাইয়া পড়ে। জল যখন

নীচে আসিয়া পড়ে তখন আর মৎস্যটা আসিতে পারে না। মৎস্যটা যখন অল্প জলে পড়ে তখন লোকেরা উহাকে ধরিতে চেষ্টা করে কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও ধরিতে না পারিলে পরে নানা অস্ত্রের সাহায্যে উহার প্রাণ নষ্ট করে এবং পরে কুঠার দ্বারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া উহাকে স্থানান্তরিত করে। যাহারা অনেক খবরা-খবর রাখে তাহাদের নিকট অনেক বৃহৎ মৎস্যের গল্প শুনিয়াছি। মৎস্যে আস্ত মানুষ পর্যন্ত খাইতে পারে ইহা আর গল্প বলিয়া মনে হয় না। সমুদ্র জীবের কথা অনেকেই অনেক জানেন সুতরাং এ-স্থানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আর লিখিলাম না।

প্রত্যাবর্তনের পূর্বাবস্থা

গভর্নমেণ্টের গোপন খবরও আমরা নানা উপায়ে সংগ্রহ করিতাম। স্থানীয় শাসকের সঙ্গে ভারত সরকারের যে সকল খবরা-খবর চলিত তাহাও আমরা পাইতাম। দেশে ফিরিবার পূর্বে আমাদের warrant ও history sheet যখন বাছাই হইতে লাগিল তখনই সংবাদ পাই যে আমাদের সম্বন্ধে একটা কিছু পরিবর্তন হইবে। তাহা ভাল হবে বলিয়াই ধারণা ছিল। বিশেষতঃ মন্দটা কাহারও প্রীতিকর নহে বলিয়া মানুষ সে দিকটা আর ভাবিতেই চায় না। পূর্বে বলিয়াছি Hon'ble Mr. Guyne ও আমরা এক সঙ্গেই ফিরি। তবে তাঁহার ফিরাটা বস্তুতই ফিরা, আমাদের ফিরাটা পুনর্জন্ম এই মাত্র প্রভেদ। আর মিঃ গাইন আসার পরেই আমাদের কাগজ-পত্রের নাড়া-চাড়া CC-র অফিসে পড়ে। তিনি যখন আন্দামানে আসেন আমি তখন বাহিরে। জেলে বা বাহিরে আমাদের কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা করেন নাই বা আমাদের কোন মতামত নেন নাই। এই সকল কারণেই মনে হয় যে আমাদিগকে দেশে পাঠান হইবে ইহা সিমলা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পূর্বেই ঠিক করা হইয়াছে। রওনা হবার তিন মাস পূর্বে হইতেই আমাদের সম্বন্ধে জনরব প্রচার হইতে লাগিল! আজ যাই কাল যাই, এরূপ ভাবে কত কথাই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যতবার কলিকাতার জাহাজ আসিয়াছে এই জনরব প্রকাশের পর ততবারই আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। কতবার জাহাজ আসিল, গেল কিন্তু আমাদের প্রতি ভাগ্য-বিধাতা সুপ্রসন্ন হইলেন না। যতই দিন অতীত হইতে চলিল ততই জনরবের উপর নানা কারণে বিশ্বাস জন্মিল।

বহু দিবস যাবৎ দেশ ছাড়া। যে দেশের মুখ আর দেখিব না বলিয়া আশা ছিল, আজ সেই নিরাশার স্থলে যখন আশা স্থান পাইল, তখন আনন্দে মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মরা মানুষ জীবন ফিরিয়া পাইলে যেমন আনন্দ পায় আমাদের আনন্দও সেইরূপ। আমার সে সময়ের সেই মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সঠিক খবর পাইবার জন্য সেই সময়ে CC-র অফিসের অনেক লোককে অনেক বিরক্ত করিয়াছি,

অনেকে অনেক বিপদের কাজ করিতেও ত্রুটি করে নাই। জানি না তাহারা যে কেন আমাদের জন্য শত বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এ-কাজ করিয়াছে। অঃ মিঃ গাইন যাবার পর আমাদের কুষ্ঠি প্রভৃতি সরকারী অফিসে নাড়া-চাড়া পড়ার পর আমাদের একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল। আশা ফলবতী হবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই বলিয়া মনে আনন্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা শান্তি পাইতেছিলাম না।

ছয় দিবস পূর্বে খবর পাইলাম যে, পরের মেলেই আমাদের বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। খবর পাইয়াই জেলে সংবাদ পাঠাইলাম। সংবাদ পাইয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, কারণ আমরা শুধু বাঙ্গালী কয়জনই যাইতেছি। লাহোর ও বারমা ষড়যন্ত্র মামলার ভ্রাতৃগণকে ফেলিয়া যাইতে হইবে ইহাই দুঃখের বিষয়। আবার ইহার মধ্যে মালদহ খুন মামলার শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস বাদ পড়িল। অনেক চেষ্টা করিলাম কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে নিয়া যাবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। সকলেই যাবার সংবাদ পাইল কিন্তু মহেন্দ্র যাবে না বলিয়া সংবাদ পাইয়া কেহই সুখী হইল না। সে আবার বয়সে সকলের অপেক্ষা ছোট এ জন্যই সকলের দুঃখের মাত্রা আরও বেশী হইল। আমরা সকলেই যাহার যাহা কিছু ছিল গুছাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলাম। পুস্তকাদি যাহা কিছু ছিল তাহার কতক কতক সাধারণ নির্বাসিতগণকে দান করিয়া বোঝা কমাইয়া লইলাম। ১৯২০ সালের ২১শে আগষ্ট আমরা প্রথম সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করি। ইহার পর ২৬শে তারিখ CC-র আফিস হইতে জরুরী চিঠি লোক মারফৎ বাহিরে যে যে স্থানে ছিলাম সেই সেই স্থানের District officer-এর নিকট পাঠায়। যাহারা Viper Bimberly ganj জেলায় অনেক দূরে দূরে ছিল তাহারা রাত্রিকালে সংবাদ পাইয়া রাত্রেই রওনা হয়। এরূপ রাত্রে রাত্রে ব্যবস্থার কারণ, আসিবার সময় যেন আমরা কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে না পারি। সকলকেই জেলের বাহিরে জমা করিল। আমিও ২৬শে তারিখ সে স্থানে গেলাম। বহু দিবস যাবৎ কাহারও সঙ্গে দেখা নাই আজ এই শুভ মুহূর্তে হঠাৎ সকলের সঙ্গে দেখা হওয়া বড়ই আনন্দের বিষয় হইল। এ-স্থানে ২৮শে আগষ্ট ১২টা পর্যন্ত বাস করিলাম। ২৮শে তারিখ আমাদের প্রত্যাবর্তনের দিন। সে দিন সকালে আমাদের সনাক্ত হইয়া গেল। যাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতেছি তাহারা সকলেই জেলে আবদ্ধ। তাহাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নহে। জেলের বাহির হইতে

দোতালা ও তেতালার লোককে দেখা যায়। পূর্বে জেলে সংবাদ দিলাম যে আমরা ৮টার সময় জেলের চতুষ্পার্শ্বে দেখা করিবার জন্য ঘুরিব। তদনুসারে আমরা পাহাড়ে ও গাছে উঠিয়া অনেকের সঙ্গেই দেখা করিলাম। তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যাত্রা করার কিছু পূর্বে আমাদের সকলের পায়েই বেড়ী পরাইল। আমরা যখন বাহির হইয়া জেলের সম্মুখে আসিলাম তখন হাওলদার, জমাদার, টিণ্ডেল প্রভৃতি দেখা করিবার জন্য আসিল। যদি কেহ কোন অন্যায় করিয়া থাকি তাহার জন্য সকলের নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া বিদায় লইলাম। ক্রমে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘাট সেই স্থান যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম। আমাদের যাত্রার বার্তা অনেক স্থানেই অনেকের নিকট নানা ভাবে প্রচার হইয়াছে। পরিচিত-অপরিচিত অনেকেই শেষ দেখা করিবার জন্য সমবেত। পরিচিতদিগের সঙ্গে আলিঙ্গন, অপরিচিতদিগকে অভিবাদন করিয়া এবং উপকারী বাবুদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি, শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুত ফণীন্দ্র ভূষণ রায়, শ্রীমান গোবিন্দ চন্দ্র কর, শ্রীযুত অমৃত লাল হাজরা, শ্রীযুত নরেন্দ্র মোহন ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, শ্রীযুত সানুকুল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত নিকুঞ্জ বিহারী পাল, শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী ও শ্রীমান যতীন্দ্র নাথ নন্দী আন্দামান ত্যাগ করিলাম।

আমরা রক্ষিগণসহ বোটে আরোহণ করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম; সে সময় দর্শকগণকে আমাদের ভূপেনবাবু তাসের নানারূপ খেলা দেখাইল। এ-স্থানে বাঙ্গালী জাদু জানে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, এমন কি অনেকে বিশ্বাসও করিয়া থাকে। আমাদের এ তাসের খেলা দেখিয়া বাঙ্গালী জাদুকর একথা সকলের মধ্যে অকাট্য সত্য বলিয়া মনে হইল। ঘাট হইতে বোট ছাড়িল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাদু ক্রীড়াও বন্ধ করিলাম। এই দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে প্রাণের মিলন ছিল তাহারাও এই বোটে উঠিয়া সঙ্গী হইল। তাহারা জাহাজে উঠিয়া জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গের-সঙ্গী ছিল। জাহাজের প্রথম whistle শব্দের পরেই তাহারা আমাদের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইল।

প্রত্যাবর্তন

জাহাজের দ্বিতীয় whistle পড়িল, নঙ্গর তুলিয়া জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। তখন বেলা ৫টা হইবে। পোতখানা তাহার চির পরিচিত পথ বাহিয়া মন্থর গতিতে চলিল। এ যাত্রার অবস্থা অনেক ভাল। প্রথম যাত্রার সময়ে আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ডাণ্ডা-বেড়ি ছিল আর সকালে-বিকালে একটু হাওয়া খাওয়ার সময় ব্যতীত সর্বদা তালা বন্ধ; এবার শিকল-বেড়ী এবং দিনরাত্র খোলা। কিন্তু স্থানটা সেই গুদাম গোলায়, সে বিষয়ে কোন সুবিধা হইল না। সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন, বহুকাল আশাহীন হইয়া দিন কাটাইতে ছিলাম আজ সেই নিরাশার ঘোর কাটিয়া গেল, হঠাৎ যেন ঘোর তমসাবৃত রজনীর অন্ধকার অপসারিত হইল। সমস্ত দিবস এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া কাটাইলাম, বিকাল বেলা জাহাজখানা সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। তখন সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা রাখিতে পারিল না। এদিক-ওদিক দুলিতে আরম্ভ করিল। আমাদেরও ছুটাছুটি করিবার শক্তি কমিয়া আসিল। আশুবাবু ও ভূপেন বাবু ব্যতীত সকলেরই অবস্থা কাহিল হইয়া আসিল, তবে আমার ও ফণী বাবুর অবস্থা সকলের অপেক্ষা বেশী। আমি এই যে ২৯শে তারিখ শুইলাম, জাহাজখানা ১লা সেপ্টেম্বর গঙ্গার মুখে না আসা পর্যন্ত শয্যা ত্যাগ করিলাম না। খাবার বেলায়ও শুইয়া শুইয়া কোন প্রকারে ৩১শে তারিখ শেষ করিলাম।

১লা সেপ্টেম্বর সকালবেলা গঙ্গার মুখে পোতখানা পৌঁছা মাত্রই তাড়াতাড়ি উপরে যাইয়া দেশের মুখ দেখিলাম; কোটী কোটী প্রণাম জানাইয়া মনের রুদ্ধ আবেগ ব্যক্ত করিলাম। দেশের ধূলিকণা মিশ্রিত গঙ্গা সলিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইলাম। সমস্ত দিন দেশের পূর্ব পরিচিত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যে ঘাট হইতে মাতৃভূমিকে শেষ প্রণাম জানাইয়া

বিদায় নিয়া ছিলাম, আজ সেই কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘাটে আসা মাত্রই উপর হইতে দেখিলাম একজন assistant জেলার আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রথম বুঝিতে পারি নাই যে কোন জেলের জেলার উনি। অবতরণ করিয়া প্রথম মাতৃভূমির ধূলি মাথায় ধারণ করিয়া পরে জেলারের সঙ্গে কোন জেলে যাইতে হইবে সেই উদ্দেশ্যে আলাপ করিলাম। আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমাদিগকে Presidency জেলে যাইতে হইবে। গাড়িতে আরোহণ করিয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রের রাজ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসা মাত্রই এখান হইতে হুকুম হইল যে Alipore New Central জেলে আমাদিগকে যাইতে হইবে। আবার ফিরিয়া সে স্থানে গেলাম।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রবেশ

সম্মুখ দ্বার অতিক্রম করিয়া ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পূর্বে এ-জেল দেখি নাই, এবারই প্রথম। জেলারের প্রকোষ্ঠে যাইয়া আমাদের পূর্ব পরিচিত প্রেসিডেন্সি জেলের Chief Head warder Arther Rion-এর সঙ্গে দেখা হইল। সে সেই জেল হইতে বদলি হইয়া এখানে আসিয়াছে। সে-ই আমাদিগকে গ্রহণ করিল। বোমা-রিভলবারের জন্য আমাদের তালাসি লইয়া আমাদিগকে X ও Y দুই দলে বিভক্ত করিল। X দলে আমি, ত্রৈলোক্যবাবু, নিকুঞ্জবাবু, অমৃতলাল বাবু, নরেনবাবু, আশুবাবু, সত্যবাবু, ভুপেনবাবু এবং Y দলে সানুকুল বাবু, ফণীবাবু, যতীন ও গোবিন্দ। আমরা European Ward No. I-এ আর Y Class No. II-তে গেলাম। আন্দামানে আমাদের কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, এখানে একটা নূতন উপাধি ধারণ করিলাম। এই X ও Y-এর মর্ম আমরা পূর্বে বুঝি নাই, পরে জানিলাম যে X Class dangerous আর Y Class less-dangerous* Y দিগকে আমাদের হইতে পূর্বেই পৃথক করিয়া রাখিল। তখনও আমাদের ধারণা ছিল যে এক সঙ্গেই থাকিব। ৬টার সময় আমাদিগকে যখন আনিল. নম্বরে প্রবেশ করার পর দেখিলাম যে আমরা দল ভাঙ্গা। কিন্তু প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের আন্দামান বন্ধু শ্রীযুত গোপেন্দ্রলালকে দেখিলাম। এই সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত জানিতাম না যে তিনি কোথায় আছেন। আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আনন্দভরে সকলে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলাম। গোপেনবাবু চির কৃশ সকলের আনন্দের ধাক্কায় তিনি তো চাপা পড়িয়া অজ্ঞান হবার উপক্রম। যাহা হউক পূর্বে পরিচিত বন্ধুকে পাইয়া আমরা নূতন স্থানে যেন একটা মস্ত সম্বল পাইলাম। নূতন জেলে আসিয়া আমাদের আর কিছুর জন্য চিন্তা করিতে হইল না।

এর সঙ্গে আরও লোক ছিল, কেবল তিনি একা ছিলেন না। তাহার

* ইহা CID Police কর্তৃক নির্বাচিত।

সঙ্গে ঢাকা Station shooting মামলার শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন রায়, শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ। ঢাকা Fighting মামলার শ্রীযুত হরি চৈতন্য দে; ঢাকা অশোক লেনের শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত মজুমদার, শ্রীমথুর চন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীসুধীর চন্দ্র মজুমদার ছিল। আমরা যে নম্বরে প্রবেশ করিলাম সে স্থানে ছিল প্রফুল্ল ও সতীশ, অপরেরা আমাদের Y দলের সঙ্গে ছিল; কেবল হরিবাবু ছিলেন পৃথক। তাহাদিগকে পাইয়া আমরা যেমন সুখী হইলাম তাহারাও আমাদিগকে সাথীরূপে পাইয়া তেমনই সুখী হইল। আমরা বহুদিন যাবৎ নির্বাসিত ছিলাম, দেশের কোন সংবাদই পাইতাম না, আজ এই সাথীদিগকে পাইয়া তাহাদের নিকট হইতে অনেক সংবাদ পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইলাম। আমরা যখন নম্বরে প্রবেশ করি তখন তাহারা আহার করার জন্য ব্যস্ত। প্রবেশ করা মাত্রই তাহাদের খাদ্য আমাদিগকে দিয়া অতিথি সৎকার করিল। আহারাদি শেষ করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলেই আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভবিষ্যৎ আনন্দের আশায় রাত্রি যাপন করিলাম। দেশের সাত বৎসরের অতীত কাহিনী শুনিবার জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল, সকলেরই চিত্ত উৎকণ্ঠিত, এক গোপেনবাবু ব্যতীত আর সকলেই আমাদের অপরিচিত, সকলেই আমাদের অনেক পরে দণ্ডিত। তাহারা এখানে পুরাতন হইলেও আমাদের নিকট অতি নূতন। সুতরাং নূতনের নিকট অনেক নূতন সংবাদ আশা করা যায়।

রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালবেলা বেড়িকাটা পোষাক পরিবর্তন ইত্যাদি কার্য হইয়া গেল, ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিলাম; পুনরায় ভারতীয় জেলের জীবন আমাদের এই ১৯২০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইল। আন্দামানের পূর্বে ভারতীয় জেলে পরে আন্দামানে আবার ভারতীয় জেলে জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান সময় কাটিয়া গেল। এখানে জেল জীবনের শেষ কাল আরম্ভ হইল। নূতন যুবক সাথীদিগকে পাইয়া একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন পাইলাম। সেই সাথীদিগের সঙ্গে কেমনে দিন কাটাইলাম তাহারই কিছু আভাস এখানে পাঠকগণকে দিব।

আমরা ২রা তারিখ পর্যন্ত কোন কাজ পাই নাই। আমরা যাহাদের সহযাত্রী হইলাম সকালবেলা দেখিলাম তাহাদের জন্য Envelopes প্রস্তুত করিবার জন্য কাগজ ও আঠা আসিয়াছে, আমরা এ কাজ কোন দিন করি নাই, সুতরাং ইহা আমাদের নিকট প্রথম শক্তই মনে হইল। প্রত্যহ ২০০০

প্রস্তুত করাটা আমাদের নিকট অসম্ভব মনে হইল। ২000-এর নিয়ম থাকিলেও বন্ধুদের মধ্যে কেহই ১000-এর বেশী দেয় না, কারণ তাহারা অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না ; এ না হওয়াটার মধ্যে যে কতকটা অনিচ্ছা আছে তাহা আমরা পরে টের পাইলাম। এরূপ হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে। কয়েদীর প্রকৃতির মধ্যে এটা সর্বদাই গুপ্ত থাকে। পারতপক্ষে স্বেচ্ছায় কাজ করিয়া জেলের আয় করিতে কয়েদী এখনও প্রস্তুত নহে। তাহার উপর আবার আমাদের অবস্থা অন্য প্রকার। আমরা যাহা কিছু করিয়াছি তাহা নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য নহে ; সকলই সকলের জন্য, সকলই দেশের জন্য, সকলই মা'র ভোগের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য। আমরা সাধারণ অপরাধীর ন্যায় নিজেকে মনে করি নাই। সরকার যাহাই মনে করুক না কেন, আমরা মনে করি যে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জেল ভোগ করিতেছি। কাজ যাহাই করুক না কেন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কাজের সকল সময়টা কাজ নিয়া বসিয়া থাকিতেই হইবে। মাঝে মাঝে পরিদর্শন হয় (Inspection) সে সময় যদি কাজ করিতে না দেখে বা কাজের সামনে বসা না দেখে তবে রিপোর্ট হয় এবং দণ্ড পায়। আমরা যখন আন্দামানে ছিলাম তখন আমাদের কাজ ছিল নির্দিষ্ট। কাজ শেষ করিয়া বসিয়া থাকিলেও ক্ষতি নাই। এখানে পর দিবস আমরা কাজ পাইবার পর এই নিয়মটা আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। কিছু দিন জেলার ও Superintendent-এর হাব-ভাব বুঝিবার জন্য আমরা নিয়ম পালন করিয়া চলিলাম। প্রায় দুই মাস পর এক দিন আশুবাবু বেলা প্রায় ১॥টার সময় কাজের সামনে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে এমন সময় Surgeant আসিয়া তাহাকে ধরে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে কাজ কেন করিতেছে না ; তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, যে কাজ শেষ হইয়াছে। Surgeant বলিল, "বেশী কাজ করিতে পার তাহা না করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছ ; কাজের সময় পুস্তক পাঠ করিতেছ, আমি তোমার নামে রিপোর্ট করিব" ইত্যাদি ভাবে কিছুক্ষণ বলার পর আশুবাবু বলিল যে আমি কাজ করিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। এই সকল কথাগুলি খুব জোর দিয়া বলাতে সে ভয় পাইয়া গেল এবং আর কিছু করিল না। এরূপ একটা ঘটনা হওয়ায় আমরা সকলেই প্রতিরোধের হিসাবে (as protest) একই নীতি পর দিবস হইতে অবলম্বন করিলাম ; ক্রমে এই ভাব চলিতে লাগিল।

আমরাও বেহায়া হইয়া লাগিলাম। পরে এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে ১০টার পর আর কেহই কোন কাজ করিতাম না।

আমাদের দুই দলকে পাশাপাশি দুই নম্বরে রাখিয়াছে। মাঝখানে একটা পরদা ও দরজা। আমরা সঙ্গীদিগের সঙ্গে অনেক সময় কথা বলার চেষ্টা করিতাম ঐ ফটকের সামনে বসিয়া। আমাদের গুর্খা পাহারাওয়ালা এ সম্বন্ধে আপত্তি করিত কিন্তু আমরা তাহা শুনিতাম না। গুর্খারা হুকুমের চাকর। তাহারা হুকুমের বাহিরে এক-পা নড়িবে না, আবার আমরাও আমাদের যেটুকু দরকার তাহা করিবই। এই সকল ছোটখাট ব্যাপার নিয়া তাহাদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। অনেক সময় Superintendent-এর নিকটও এই সকল বিষয় Report হইত। তাহার নিকট আমাদের জবাব ছিল, "আমরা এক মামলার লোক এবং এক সঙ্গে বহুবৎসর থাকিয়া আসিয়াছি, আমরা একজন আর এক জনের চোখে চোখে পড়িলে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিব না; সংসর্গ প্রিয় মানুষ কখনও বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গীহীন হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা দণ্ড পাইয়াছি তাহা ভোগ করিতেছি আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; ইহার উপর আবার যদি এই সকল নিয়ম করা হয় তবে আমরা তাহা সহ্য করিব না। আর যদি তোমরা তাহা করিতে চাও তাহা হইলে আমাদিগকে দূরে দূরে রাখ, যাহাতে আমরা একে অন্যকে দেখিতে না পারি। বন্ধুকে সামনে রাখিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারিব না, তাহার সঙ্গে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিব, ইহা তোমাদের কোন শাসনেই করাইতে পারিবে না আর যদি তাহা করাইতে চেষ্টা কর তবে আমরা জেলের কোন নিয়মই পালন করিব না। তোমার শক্তিতে যাহা হয় কর, আমাদের শক্তিতে যাহা কুলায় তাহা করিবই করিব।"

গুর্খা পুলিশ বদলি হইবার পর আবার military police আসিল। পূর্ব গোলমাল আবার পাল্টাইয়া আরম্ভ হইল। গুর্খারা আমাদের অনেক কথা বুঝিতে পারিত না সুতরাং তাহাদের সঙ্গে আমাদের গোলমালটা বেশী গড়ায় নাই। এই পুলিশদের সঙ্গে তাহা ভালরূপ পাকিয়া উঠিল। সানুকুলবাবু, আশুবাবুর সঙ্গে কথা বলিয়াছে বলিয়া এই পুলিশদের সঙ্গে বেশ ঝগড়া হয়; সানুকুলবাবু যথা ইচ্ছা গালাগালি করিয়া জব্দ করে। তাহারা Supdt-এর নিকট গিয়া Report করে, তাহার ফলে সে আসিয়া আমাদের উপর বেশ চোটপাট করিল, আমরাও আমাদের পক্ষে যাহা

বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। তুমুল বাগবিতণ্ডার পর হুকুম দিয়া গেল আমাদিগকে cell-এ বন্ধ করিবার জন্য। আমরা বন্ধ হইলাম ; কাজ আনিয়া দিল, অস্বীকার করিলাম। খাবার আসিল অস্বীকার করিলাম। সবই অস্বীকার করার কারণ বিনা-বিচারে কেন আমাদিগকে বদ্ধ করিল ! খাবার অস্বীকার করার পরই জেলার আসিল, জেলারকে খুব কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম, সে যাইয়া আমাদের হাব-ভাব ও সঙ্কল্প Supdt-র নিকট বলিল। তাহার পরই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য হুকুম হইল। সর্বপ্রকার গোলমালের মূল যে দুই নম্বরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশার অভাব এবং প্রতিবন্ধক দরজা বন্ধ, তাহা স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমরা বহুদিন পর পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধুদিগের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইলাম।

এই জেলে বাস করার কালে ছোটখাট অনেক সময় নানারূপ গোলমালই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হইয়াছে। নানা সময়ে বিবিধ প্রকারের কাজও করিতে দিয়াছে। এই সকল কাজের মধ্যে একবার পাটফেনা দেয়। কাজটা সহজ হইলেও বড় ময়লা। এ-কাজ আমরা কিছুদিন করিয়া আর করিব না বলিয়া জেলারকে জানাই। যদি এ-কাজ বেশী দিন করি তবে Asthma, Phthisis প্রভৃতি হবার আশঙ্কা আছে ; আর আমাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যবাবুর পূর্ব হইতে Asthma আছে। এই সকল কারণেই অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। কিছুদিন উভয় পক্ষের বাক্য-যুদ্ধের পর এ কাজটা বদলাইয়া দিল। বাক্যযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষ হইতে যে সকল কথা বলা হইয়াছিল তাহা এখানে প্রকাশ করা ভাল বিবেচনা করিলাম না বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

আমাদিগকে যে চিরকালই পর্দানসিন করিয়া রাখে এ সকল আভাষ পূর্বে অনেক স্থানে দেওয়া হইয়াছে। এই জেলে প্রবেশ করার পর আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হইল। এবার আমরা ঘরের কোনে বাস করিতেছি। কোন ফাঁকে যে কোন কথা হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়া বাহির হইয়া যায় সেই ভয়ে সর্বদা আমাদের উপর কড়া পাহারা রাখিল। শুধু কালা দ্বারা বিশ্বাস নাই বলিয়া ইহার উপর গোরা পাহারা। ডাক্তারের উপর আস্থা নাই বলিয়া ডাক্তারকে Surgeant প্রহরী লইয়া প্রবেশ করিতে হয়। আমাদিগকে যে স্থানে রাখিল সেই প্রাঙ্গনের চার-পরদার বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বাস করিতে

লাগিলাম। ঘরগুলি দোতালা কিন্তু বাহিরের অন্যান্য কয়েদীদিগকে বা আমাদের মুখ কয়েদীরা যাহাতে না দেখিতে পারে সেই জন্য দোতালার উপরে যাবার হুকুম নাই। দেশে ফিরিয়া আসিলাম, মনে করিলাম দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হইবে দুটা খবর পাইব, কিন্তু আমাদিগকে যে অবস্থায় রাখিল তাহাতে ঐ সকল সুযোগ পাবার উপায় রহিল না, আন্দামানে প্রাঙ্গনগুলি আয়তনে বড় ছিল। ইচ্ছা করিলে ঘুরাফিরা করিতে পারিতাম। এখানে সঙ্কীর্ণ স্থানে আমাদের সে উপায়ও রহিল না। দুইটি প্রাঙ্গনের মধ্য দ্বার যদি প্রথম উন্মুক্ত করিয়া দিত তাহা হইলেও 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' মনে করিতে পারিতাম। যতদিন বাস করিলাম ততদিন এই পিঞ্জরাতেই বাস করিতে হইল। আর এই দশ বৎসরের মধ্যে এক দিনও কুঠির (Cell) বাহিরে বাস করিতে পারিলাম না।



প্রতুল গাঙ্গুলী

লেখাপড়া ও সময় কাটানো

কাজ-কর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছি। এত দীর্ঘকাল কিরূপে কাটাইলাম সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। আন্দামানে সময় কাটাইবার একমাত্র অবলম্বন ছিল পুস্তক পাঠ, এখানেও সে সুযোগ পাইলাম। দণ্ড হওয়ার পর বহু বৎসর বৎসরে একখানা চিঠি লেখা ব্যতীত লেখার সঙ্গে কোন সংস্রব ছিল না, সুতরাং লেখার অভ্যাসটা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। বর্ণ অশুদ্ধ প্রথম এত হইত যে তাহা বলিবার নহে। ক্রমে আমরা সপ্তাহে এক দিবস করিয়া নানা বিষয় আলোচনার জন্য সমবেত হইতাম এবং তাহার সাহায্যে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের আলোচনার বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দুই জনকে প্রধান বক্তা নির্বাচন করিতাম। তাহাদের বক্তব্য শেষ হইলে উহার উপর সকলের সমালোচনা হইত। ইহার পর আমরা যখন লিখিবার অনুমতি পাই তখন প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিয়া সকলকে শুনান হইত ও উহার উপর সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া সংশোধন করিয়া লইতাম। আমাদের মধ্যে লেখক কেহই নহে—আমাদের এই প্রচেষ্টা শুধু শিখিবার জন্য। আর ইহা উপলক্ষ্য করিয়া সময় কাটাইবার জন্য।

এই উপায় ব্যতীত সময় কাটাইবার অন্য উপায় ছিল ব্যায়াম, লাঠি-খেলা ও ফুল বাগান করা। ব্যায়ামের মধ্যে হাডুডু খেলাটাই বেশ জমিত এ-ভিন্ন কোদাল কোপান, কুস্তি এবং সাধারণ ব্যায়াম। খেলার ইচ্ছা থাকিলেও সামগ্রীর অভাব ছিল। গোপেনবাবু পাশা খেলিবার জন্য ঝাঁটার কাঠিকে মেরুদণ্ড করিয়া ছক ও গুটি এবং কালি ও পেন্সিল দ্বারা ঘর তৈয়ার করিল। ইহার সাহায্যে পাশা-খেলাটা নিয়মিত ভাবেই চলিল। দাবার জন্যও এইরূপ বুদ্ধি খরচ করিয়া রাজা, মন্ত্রী, হাতী, ঘোড়া, নৌকা ও বড়ে প্রস্তুত করিল; তাস খেলার জন্য সে আমাদিগকে এনভেলাপ তৈয়ার করিবার জন্য যে কাগজ ও আঠা দিত সেই সকল কাগজ একখানার উপর আর একখানা যোগ দিয়া কার্ড তৈয়ার করিতাম, ইহার উপর ইঁটের গুঁড়া ও লাইসিঙ্গের লাল রং দ্বারা ছবি আঁকিয়া তাস প্রস্তুত

করিলাম। এই সকলের মধ্যে আমাদের গোপেনবাবুই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। Word Making-এর জন্য এ ভাবে letter প্রস্তুত হইল। Idle Brain দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে তাহার কোনটাই বাকী রহিল না। আমরা যখন হাজতে ছিলাম তখন তেঁতুল বীজ ও পোয়া মাছের দাঁত দ্বারা ষোলগুটি ও Draught খেলার আয়োজন করিলাম ও ঝাঁটার কাঠি দিয়া জামা-কাপড় সেলাই করিতাম। আমরা এখানে আসিয়া তাহাও প্রচলন করিয়া দিলাম। এইরূপ নানা উপায়ে দিন কাটাইবার সংস্থান করিয়া লইলাম। এখন ইহার পর ভারতীয় জেল সম্বন্ধে কিছু বলিব। নন-কো-অপারেশন উপলক্ষে দেশের সর্বত্রই জেল সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের সময়ে জেলের যে অবস্থা ছিল তাহা তাহারা দেখে নাই বলিয়াই কিছু কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করি। নরেন্দ্রবাবু (Narendra Nath Banerjea of Beneras Conspiracy case & Gauhati Fighting case) ইহার মধ্যেই রাজসাহী জেল হইতে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ফুল বাগান করার সখ খুব ছিল। তিনি ও ত্রৈলোক্যবাবু অতি ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যেই অনেক পরিশ্রম করিয়া বেশ একটু বাগানের সৃষ্টি করিলেন। আমার লাঠি-খেলার সখ চিরকাল আছে, একটু একটু জানিও। যাহারা শিখিতে ইচ্ছুক ছিল তাহাদিগকে শিখাইয়া সময় কাটাইতাম এবং নিজের লুপ্ত বিদ্যাকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। এখানে রং শ্যামধাৎ, চৌ-মুখী পর্যন্ত অভ্যাস করিয়াছিলাম।

ভারতীয় জেল

ভারতীয় জেলের মধ্যে প্রথম ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল, পরে প্রেসিডেন্সি জেল, বরিশাল জেল আবার প্রেসিডেন্সি জেল, নিউ সেণ্টাল জেল আর আন্দামানের সেলুলার জেল ; এই কয়টি জেল দেখিয়াছি।

১৯১২ সালে প্রথম যখন জেলের প্রধান ফাটকের মধ্যে প্রবেশ করি রাত্রি ১০টার সময় তখন সিপাহীর সঙ্গে শিকল দ্বারা ঝুলান এক ঝোপ চাবি দেখিতে পাই। সে খটাখট করিয়া একবার এদিক একবার ওদিক বুটের শব্দে নিনাদিত করিয়া একদ্বার বন্ধ করিতেছে অন্য দ্বার খুলিতেছে। ফাটকের মধ্যে তাহার এইরূপ ক্ষিপ্রতা দেখিয়া মনে হইল এখানে বুঝি সকলকেই ক্ষিপ্র গতিতে চলাফেরা করিতে হয়। মিলিটারি আদর্শই বোধহয় এখানে প্রবর্ত্তিত। ভিতরে ঢুকিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া এক ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। একজন সিপাহী দ্রুত গতিতে কোথা হইতে কয়খানা ছেঁড়া ও দুর্গন্ধময় কম্বল আনিয়া দিল। কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইলাম। ভোর হওয়া মাত্রই জেলার আসিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ ?" ভালই আছি, উত্তর দিয়া বিদায় করিলাম। জেলখানা দেখিবার সখটা চিরকালই ছিল, তাহা পূরণ করিবার জন্য বাহির হইয়া এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাহির হইতে জেলের চতুর্দিকে একটা পরদা দেখা যায় ; মনে হয় এই একটা পরদার ভিতরই সমস্ত জেলটা ; কিন্তু তাহা নহে এই বৃহৎ জেলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের অনেক জেল আছে, জেলের ভাষায় তাহাকে খাতা বলে। এই খাতা হইতে অন্যত্র যাইবার উপায় নাই, সর্বত্র তালা বন্ধ। আমাকে যে স্থানে রাখিয়াছে, সে স্থান হইতে কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। আমার নিকটে অন্য কোন কয়েদীকে আসিতে দেয় না। খাবারটা একজন পাচক নিয়া আসিত, কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন কথা বলিবার যো ছিল না। এবার যে কয়মাস জেলে বাস করিলাম তাহার মধ্যে খাঁচা হইতে বাহির হইয়া কাচারিতে খাবার সময় রাস্তাটুকু ব্যতীত জেলের আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। প্রথমবার জেলে প্রবেশ করার অভিজ্ঞতা এখানেই শেষ।

প্রথমবার প্রেসিডেন্সি জেলে

পূর্বে বলিয়াছি কালাজ্বর সঙ্গে নিয়াই জেলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ১৯১৪ সালের ২২শে আগষ্ট বেলা ৩ ঘটিকার সময় জেল ফাটকে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন আমার দাঁড়াবার শক্তি নাই। পুলিশদের স্কন্ধে ভর করিয়া মোটর হইতে নামিলাম। এ-স্হান হইতে দুই জনের স্কন্ধে ভর করিয়া জেলে প্রবেশ করিলাম।

প্রথম দিন খাবার কিছুই পাইলাম না ; অনেক কষ্টে রাত্রি কাটাইলাম। পর দিবস প্রথম ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল, পরে Supdt আসিয়া দেখিয়া গেল ; ক্রমে বেলা ৪টা বাজিল কিন্তু এক ফোঁটা জলও কেহ দিল না। এমন কি আমার নিকট পর্যন্ত কেহ আসিত না। জানি না কেন যে নিকটে আসিতে ভয় পাইত। চেহারা দেখিয়া হয়ত লোকেরা মনে করিত যে কোন সংক্রামক ব্যাধির লোক। সন্ধ্যাকালে বন্ধ করার জন্য surgeant আসিল তখন ভগ্নকণ্ঠে জানাইলাম যে আমি সমস্ত দিবস খাবার কিছুই পাই নাই। আমার শয্যার এক পাশ হইতে অপর পাশ হইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং প্রাণ যাবার অবস্হা। কাহাকে ডাকিয়া এক বিন্দু জল পাবারও উপায় নাই তখন surgeant খানিকটা সাগু আনিয়া দিল, তাহা খাইয়া বন্ধ হইলাম। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্হির। সমস্ত রাত্রি এক মিনিটও নিদ্রা নাই—রাত্রিটা পেটের নীচে বালিশ চাপা দিয়া কোন প্রকারে কাটাইলাম। পর দিবস Supdt আসার পর সমস্ত অবস্হা বর্ণনা করিলাম তাহার পর হইতে সাধারণ ব্যবস্হা হইল।

এ-স্হানে আড়াই মাস অবস্হান করাব পর শরীর যখন একটু সুস্থ হইল তখন আমাকে বরিশাল জেলে 121-A ধারার পরোয়ানা অনুসারে পাঠাইল। এ-স্থানে এক বৎসরের অধিককাল থাকি। হাজতে থাকার কালে সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে মেশা যায় না সুতরাং জেলের খাঁটি অবস্হা বর্ণনা করা যায় না। দণ্ড প্রাপ্তির পর যেটুকু দেখিয়াছি তাহার অধিকাংশ সময় আন্দামানের জেলে কাটাইয়াছি এবং সে স্থানের বর্ণনাকালে যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি। এখন এই দণ্ডের পর যাহা ভোগ করিয়াছি তাহাই বলিব।

দণ্ড হবার পর আবার ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে আসি। এখানে প্রায় সাড়ে আট মাস কাটাই। এখানে আসিয়া চির প্রসিদ্ধ সেই ৪৪ ডিগ্রীতেই বাস করি। এ-স্থানে পাঁচ মাস বাস করার পর যখন নানা স্থানে Defence of India Act অনুসারে ধর-পাকড় আরম্ভ হইল, তখন নূতন রাজনৈতিক বন্দীর আমদানী খুব বেশী হওয়াতে আমাদিগকে এক মাসের জন্য Cubical Cell-এ* পাঠায়। এই এক মাস সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে মেলামেশা করিবার সুযোগ ঘটে। নম্বরের বাহিরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বেশ আছে কিন্তু রাত্রিকালে ময়লা ও প্রস্রাবের পাত্র যখন রাখে তখন বাহিরের সকল জাঁকজমক ভুলাইয়া দেয়। তাহার উপর ছারপোকার অসহ্য যন্ত্রণা।

এ-স্থানে যত অশিষ্ট কয়েদীই থাকে। কারণ দিনরাত্র ইহাতে বন্ধ করিয়া ভাল লোককে রাখে না। আমরাও আসিয়া সেই দলে ভর্তি হইলাম। কয়েদীরা নানারূপ ভোগ-বিলাস ও বাসনা-কামনা হইতে বঞ্চিত। কয়েদখানার মধ্যে যতটা সম্ভব তাহা করিয়া নেয়। নেশার মধ্যে কোনটাই বাদ যায় না। যোগাড়ের মধ্যেও কিছুই অভাব থাকে না। দেখিলাম পয়সার অভাবও তাহাদের নাই। কারখানায় কাজ করে, সেখানে নানাবিধ জিনিষ তৈয়ার করিয়া সিপাহীদিগের নিকট বিক্রী করে, জুয়া খেলে ইত্যাদি উপায়ে পয়সা সংগ্রহ করে এবং সেই পয়সার জোরে জমাদারকে ঘুস দিয়া বাধ্য করে এবং পরে যা খুসী তাহাই করে। এইরূপ অসম সাহসের কাজ এই সব দুঃসাহসী লোকের দ্বারাই সম্ভব। ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয় তাহার দৃষ্টান্ত এই জেলে যথেষ্ট আছে। ভোগের ইচ্ছা প্রবল আছে বলিয়া তাহাদের তামাক, গাঁজা, চরস, আফিম, মদ, সন্দেশ-রসগোল্লা, তরকারি ইত্যাদির কোনটারই অভাব হয় না। প্রত্যেকেই যে এরূপ যোগাড় করিতে পারে তাহা নহে। পারে শুধু তাহারাই, যাহারা বহুবার জেলে আসিয়াছে ও যাহারা অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছে। মেদিনীপুর জেলের Supdt Parry সাহেবকে একটা (B) Class কয়েদী ছুরি দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। তাহার ফলে দুই বৎসর দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দেয়। লোকটা আমাদের এখানেই ছিল। দেখিলাম তাহাকে ভয় না করে জেলে সিপাহীদের মধ্যে এমন লোক নাই। রাত্রিকালে যখন সকলে

* জাল দ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র পারাবত খোপের ন্যায় কক্ষ।

নম্বরে নম্বরে বন্ধ হয় তখন তাহারা নানারূপ আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প জুড়িয়া দেয়। নূতন লোক যাহারা প্রথম অবস্থায় সামান্য দণ্ড পাইয়াছে, সেই নূতন পুরাতনকে এক সঙ্গে রাখে বলিয়া এ (A) ক্লাস, বি (B) ক্লাস লোককে একত্র বাস করিতে দেয় বলিয়া অনেক প্রথম দণ্ডিত (First offender) আরও অধিক খারাপ হইয়া যায়। জেলে আসার পর তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া বরং উল্টা ফলই হইয়া থাকে। যাহারা ছেঁচড়া চোর, যাহারা লতাপাতা চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছে তাহারা পাকা হইয়া বাহির হয়। জেলে আসিয়া বড় বড় দলের সন্ধান পায়। অনেকে বাহির হইয়া সেই সকল দলে যোগ দেয় এবং পরে পাকা হইয়া উঠে।

পয়সা রাখিবার স্থান কোথায় একথা পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। গলার ভিতরে খোপর (Monkey bag) করিয়া তাহার মধ্যে রাখে। এই খোপর ,গলার ভিতরে দুই দিকেই হইতে পারে। প্রত্যেকটা খোপরে ১০-১০টা গিণি রাখিতে পারে। উহা হইতে ইচ্ছা করিলেই আবার বাহির করিতে পারে। এই সকল স্বচক্ষে এখানে আসার পর দেখিয়াছি। এইরূপ লোকের মধ্যে যাহারা রোগের আক্রমণে মৃত হয় Post mortem করার সময় তাহাদের সেই গুপ্ত ধন পাওয়া যায়। ইহা সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প শুনিয়াছি। তাহা শুনা কথা বলিয়া উল্লেখ করিলাম না। এই এক মাস পূর্ণ হবার পরই আমাদিগকে আবার সেই ৪৪ ডিগ্রীতে লইয়া গেল।

এ-স্থানে সকল কয়েদীর সঙ্গে মিলিয়া একটা জিনিষ দেখিলাম যে স্বেচ্ছাধীন চলিতে সকলেই চায়। তাহার মূলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের বা তাহা ভোগ করিবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিয়া বা না বুঝিয়া ইহা লাভের চেষ্টা করিতে পারে, ভোগ করিতে পারে। জেলের নিয়ম বড় শক্ত ; সেই নিয়ম অনুযায়ী চলা সকলের পক্ষেই কঠিন। কঠিন হইলেও তাহা কয়েদী দ্বারা পালন করাইতে চেষ্টা করে ; চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য অনেক স্থানেই হয়। বিফল হইয়া কিছু দিন চুপ করিয়া থাকে, আবার কিছুকাল পর আরম্ভ করে। নানা জেলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি যে, কয়েদীকে অল্প অল্প স্বাধীনতা দিলে জেলের অবস্থা অনেকটা ভাল থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যে কয়েদী দুর্দান্ত, যাহাদিগকে কিছুতেই শৃঙ্খলার ভিতর আনা যায় না তাহাদিগকে কিছু কিছু

সুবিধা ভোগ করিতে দিয়া শান্ত রাখা হয়। সকল গোলমালের গোড়ায় খারাপ খাদ্য। খাইতে বসিয়া যখন ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে না, মুখে কোনটা রোচে না তখনই ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। একবার জমাট বাঁধা ক্রোধ ফাটিয়া পড়িলে আর দমন করিবার উপায় থাকে না। তখনই নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়।

খাদ্য সম্বন্ধে শুধু আন্দামানের জেলের বর্ণনাই দিয়াছি। এখানে প্রেসিডেন্সি জেলের কথা কিছু বলিব। ভাত, শুধু নামে তাহার সঙ্গে এক অষ্টমাংশ ধান এবং অপর এক অষ্টমাংশ পাথরকণা ; ইহার রংটা আগুনে পোড়া সুরকির ন্যায়। গন্ধটা প্রথম দিবস পাওয়া মাত্রই যাহা মনে হইয়াছিল তাহা শকুনী গন্ধা। মুখে দিয়া চর্বনেই করাৎ-করাৎ করাত কাটার ন্যায় শব্দ। গলায় গেলে ধানের মৃদু মধুর খোঁচানি। সংখ্যায় এত অধিক যে ধান ভাত পৃথক করার উপায় নাই, আর পথরগুলি সাদা ও লালচে অর্থাৎ ভাতের সঙ্গে এক রং, সুতরাং তাহাকেও ভাতের মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার উপায় নাই। তরকারী অধিকাংশ দিনই অচেনা। তাহার কোনটা যে লোক খায় বা খাবার উপযুক্ত তাহা বাছিয়া বাহির করা একমাত্র Chemist-এর সাধ্য। যদি বা কিছু থাকে তাহা হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়। ইহাকে দাস্যাদি পাচন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গন্ধে গুলজার করিয়া তোলে। শেষ কালে হইল ডাল। কত ডালের সঙ্গে কতটা জল দিতে হয় তাহার একটা পরিমাণ আছে। এখানে দেখিলাম সেই পরিমাণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। উহাকে ডাল না বলিয়া ডালছানা জল বলিলেই চলে, খানিকটা সিদ্ধ ডালের উপর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ভাতের উপর ডাল যে কোথায় চলিয়া যায় তাহার সন্ধান থাকে না। কোন দিন হয়ত অগ্নির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয় যে গন্ধে নাসিকা দাহ উপস্থিত হয়। এ ভাবেই লোক দিন দিন এই অখাদ্য খাইয়া জীবনী-শক্তি হারায়।

জেলে একজন Superintendent থাকে তাহার দক্ষিণ হস্ত থাকে জেলার, আর বাম হস্ত থাকে Deputy জেলার ও এক দল Assistant জেলার। সাক্ষাৎ সম্বন্ধটা থাকে শুধু জেলার ও Deputy জেলারের সঙ্গে, তাহাদের দায়িত্বটা সকলের অপেক্ষা বেশী। মাল-গুদামের ও খাবার দাবার ভার থাকে ডেপুটি জেলারের উপর। Superintendent সম্পূর্ণই নির্ভর করিয়া থাকে তাহার উপর। এই ডেপুটি জেলারের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছে গুদাম জমাদার। খাতাপত্রের হিসাবটা ডেপুটিবাবুর নিকট,

আর মাল জমা করা ও খরচ করার ভারটা থাকে গুদাম জমাদারের উপর। সে-ই প্রকৃতপক্ষে মাল-গুদামের কর্তা। সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। কয়েদীকে একটা জিনিষ দিয়া দুইটা পয়সা পাইতে পারে। আবার ঘুষির বদলে একটু চিনি দিয়া খুসীও করিতে পারে।

সরকার কয়েদীর জন্য যাহা দৈনিক দিয়া থাকে তাহার বেশীর ভাগই তাহারা পায় না। মৈমনসিংহের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ রাজনৈতিক অপরাধে এক সময় জেলে ছিলেন। সে সময় তিনি কিছুদিন গুদামের লেখাপড়ার কাজ করিতেন। এইরূপ অনেক সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এসব কথা অবিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। Superintendent প্রত্যহ খাবার দেখিয়া থাকে; তাহাকে যেমন দেখান হয় তাহার সঙ্গে কয়েদীর খাদ্যের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। আবার LGP-কে মাল-গুদামে যেমন মাল দেখান হয় তেমনটা কয়েদী পায় না। কখনও ডাল চাউল একদিনের জন্য জেলে ক্রয় করে না। বৎসরের মাল প্রায় এক সঙ্গে ক্রয় করে। যদি বৎসরের মাল ক্রয় নাও করে, তবে অন্ততঃ ছয় মাসেরটা সকল জেলেই ক্রয় করিয়া থাকে। হাজার, দুই হাজার বস্তার মধ্যে সকল বস্তা খুলিয়া দেখার সময় কখনও কোন IGP-র হয় না। তাহারা দুই ঘণ্টার মধ্যে জেল পরিদর্শন করিয়া বিদায় হয়। সুতরাং তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ। প্রথম লাইনে ভাল চাউলের বস্তাগুলি সাজাইয়া রাখে; IGP আসিলে যে কোন বস্তা খুলিয়া দেখিলেই ভাল চাউল দেখিতে পায়। Superintendent-কেও এ ভাবে ফাঁকি দিয়া থাকে। মাকালটির মত এমন ভাবে সাজাইয়া রাখে যে দেখিয়া চালাকি ধরিবার কাহারও সাধ্য নাই। Super-কে যে খাদ্যদ্রব্য দেখান হয় তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাহাতে মসলাও ভাল থাকে, তৈলটাও দেখা যায়, রংটাও ভদ্রোচিত, মাছের দিনে মাছটাও আস্তই থাকে, পাথর-ধানও থাকে না। কিন্তু কয়েদীকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহার কথা তো ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

খাবার কথা গেল ইহার পর বস্ত্র ও শয্যার কথা বলিতেছি। গ্রীষ্মকালে যে ভাবেই হউক লজ্জা নিবারণ করিয়া কোন প্রকারে থাকা যায়। কিন্তু শীতকালেই কষ্ট। শীতকালে আমরা Cell-এর ভিতর ছিলাম; সুতরাং মজাটা বুঝিলাম ষোল আনার উপর। একটা কুর্তা আবার তাহার হাত নাই, দুইটা জাঙ্গিয়া তাহার পা নাই, একখানা গামছা আর তিনখানা

কম্বল। তিনখানা কম্বল মাত্র শীতের সম্বল। তাহা আবার পাতলা ও পুরাণ। একখানা বিলাতি মাটির আস্তরের উপর ছড়াইয়া দেই আর দুইখানা গায় দেই। যে Cell-এ আমাদিগকে রাখা হইয়াছে তাহার উত্তর দিক খোলা ; দ্বার বন্ধ করার কোন উপায় নাই। হিমের হাওয়া বিনা বাধায় ঘরে আসে। একখানা কম্বল নীচে রাখিয়া নীচের ঠাণ্ডাকে কোন উপায়েই আটকান যায় না। উপরের কম্বলখানা হিমে ভিজিয়া যায়, নীচের অর্থাৎ মাঝের কম্বলখানা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ঘুমের আবেগে কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া শুইয়া পড়িলে দুই ঘণ্টা পরই কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। শীত যতদিন খুব বেশী ছিল, ততদিন সুনিদ্রা হয় নাই। রাত্রে কতবার যে ঘুম ভাঙ্গিত ঠিক নাই। ত্রৈলোক্যবাবু অসুস্থ, তিনি Major Thomson-এর নিকট একখানা অতিরিক্ত কম্বল চাহিলেন কিন্তু রোগী হিসাবেও তাহাকে একখানা কম্বল দিল না। শীতকালে এতদ্ব্যতীত একটা কম্বল-কোট দিয়া থাকে তাহার খসখসানীতে গাত্র জ্বালা উপস্থিত হয়। তাহার গন্ধ একটা অসহনীয় যন্ত্রণা। কোন কারণে ইহা একটু ভিজিলে তাহার গন্ধটা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। Medical ground-এ Superintendent-কে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বাজেট সম্বন্ধে আবার খুব কড়াকড়িও আছে। বেশী খরচ হইলেই জবাব দিতে হয়। এই সকল গোলমালের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য super অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াও দেখে না, প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিলেও চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সকলে মালভেনি নহে যে গভর্নমেণ্টের ভয়ে নিয়ম ও বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে না। জেল কমিশন রিপোর্ট হইতে মেজর মালভেনি যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। কেবল মাত্র এই মেজর মালভেনিই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু কোন Superintendent-ই এরূপ সাহস দেখান নাই। বিজয় গোপাল রায় নামক একজন State prisoner-কে cell-এ রাখা সম্বন্ধে Govt IGP-র সঙ্গে Alipore Central Jail Superintendent Lt. Col. John Mulvany-র যে-সকল চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল তাহা এই ঃ

Appendix X of Jail Commission Report. P 413.

Referred to in question 440 (xix) Evidence of Lt. Col. J. Mulvany. Copies of correspondence relating to the treatment of state prisoners.

Confidential No 4179 241 of Alipore the 24 September, 1915 from the Supdt. Alipore New Central Jail to the Inspector General of Prisons, Bengal.

Sir,

With reference to your endorsement No. 741 Dt. Sept 22, 1915, forwarding a copy of Government letter No. 11221 P. Dated September 17th 1915 in which a report regarding the confinement of state prisoners in this Jail is called for under the provison of section 6 of regulation III of 1818. I have the honour to report as follows.

(a) In my opinion the degree of confinement to which the state prisoners are subjected is so severe as to be liable to in ure their health. The confinement is more stringently solitary than any solitary confinement imposed under the prison's act as under Jail Regulation both of which are limited strictly to seven days. Until now, howeven the health of neither prisoner has suffered. Both are cheerful, but while Babu Bijoy Gopal Roy has increased in weight from 159 lbs to 167 lbs. Babu Sudhangsu Bhusan Mukherji has lost 6 lbs from 166 lbs to 160 lbs.

(b) The arrangements made for their support are in my opinion adequate to the supply of their wants according to their rank in life. At least every wish expressed has uptil now been gratified and both express themselves satisfied with their treatment in Jail.

D/O. Letter from the Inspector General of Prisons, Bengal. To the Superintendent of the Alipore New Central Jail. Dt. the 27th Sept, 1915.

My dear Mulvany,

Please reconsider this letter. Remember it has to go to Simla and it will and it would rouse the olympean wrath. The degree of solitary confinement dictated to us by the police need of separating these prisoners not only from other

motive prisoners, but from each other. I think you might so far report that the prisoners are in solitary confinement and are permitted exercise daily and that both are cheerful and the health of neither has suffered or words to that effect. This report will go to Simla. At the same time I quite agree to show your original letter to the Chief Secretary and to represent the degree of solitary confinement and see if it cannot be modified at an early date. But your letter of the 24th if sent to Simla will only lead to orders for change which we can do ourselves in Bengal.

Yours Sincerely
Sd/- W. Buchanon
IGP

If you agree, cancel your No 4179 of 27th in your books and substitute the new one. W. B.

Confidential D/O. No. 4179(a) Dt. Alipore New Central Jail Sept. 28th, 1915.

My dear Sir,

Your D/O. of the 27th places me in a very awkward position. India wants my opinion and depend it under sec. 6 of the Reg III. In my letter I have stated my opinion very mildly but sufficiently. Really I feel more strongly than appears in my letter. To me the confinement to which those men are subjected is very in human it is such as would make a sensitive man insane. One of the prisoners is stolid but the other is not & the fact that he is keeping cheerful is due mainly to my efforts and those of Mr. Atkinson. Please excuse me speaking plainly but I feel my share in this unpleasant business most keenly. I can only comply with your wishes by omitting to reply to the direct question and this I do with most extreme reluctance I may not in my life.

Yours Sincerely
Sd/- John Mulvany

To be substituted for the letter bearing the same number and date.

উপরের চিঠিগুলি হইতে Solitary confinement সম্বন্ধে Super-এর প্রতিবাদগুলি জানিতে পারিলাম। এইরূপ কত স্থানে হয়ত হইয়াছে যাহার প্রতিবাদ হয় নাই। যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাঁহারা যেন ১৯১৯ সালের Jail Committee Report পাঠ করেন।

মানুষ মাত্রই একটা না একটা জিনিষের দাস হইয়া থাকে। লোকের সর্বাপেক্ষা নিত্য প্রয়োজনীয় ও প্রিয় একটা কিছু থাকেই। কেহ পান খায়, কেহ ধূমপান করে, কেহ নেশা পান করে, কেহ স্ত্রী-পুত্র-প্রিয়জনের মায়ায় মুগ্ধ থাকে। জেলে আসিলে কয়েদী তাহার একটাও ভোগ করিতে পারে না। হঠাৎ তাহাদের সর্ববিধ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া উন্মাদ হইয়া উঠে। সাধারণ লোক যাহারা নিজেদের মনকে বুঝাইবার যুক্তি রাখে না, যাহারা চঞ্চল ও ধৈর্য্যহীন তাহারা ইহার মধ্যেই পুরাতন কয়েদীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যোগাড়ের সন্ধান জানিয়া ইচ্ছানুরূপ লোভের ও ভোগের নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করে। যখন চেষ্টায় নিযুক্ত হয় তখনই জেলের আইন অমান্য করিতে বাধ্য। আবার আইনও এমন শক্ত যে একটু এদিক-ওদিক হইলে আইন ভঙ্গ হয়। খাওয়া শোওয়া কাজ করা ছাড়া অন্য কিছু করিতে গেলেই আইন অমান্য করা হয়। দুইজনে কথা বলিলেও আইন অমান্য! এরূপ কড়াকড়ির জন্যই জেল খাটাটা অত্যন্ত কষ্টের মনে হয়। জেল যে Reformatory তাহার অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ পায়। যেখানে যত চাপাচাপি সেখানেই তত নিয়ম ভঙ্গের আশঙ্কা বেশী। এই জেলে যে Criminal mentality-র লোক বেশী দেখা যায় তাহার কারণই সর্ববিধ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ। আবার এই লোকগুলিই যখন বাহিরে থাকে তখন তাহাদের স্বভাবটা অন্যরূপ থাকে ; শান্ত ও শিষ্ট। তাহার কারণ বাহিরে তাহারা ইচ্ছানুরূপ ব্যক্তিগত মত অনুসারে চলিতে পারে এবং নিজেকে অনেকটা স্বাধীন বলিয়া মনে করে। এই সকল লোককে যদি কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে বোধহয় জেল যে Reformatory তাহার কিছু অর্থ হইতে পারে ও যাহারা Criminal mentality-র লোক তাহাদের স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হইতে পারে। সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই ধূমপান করে ; তাহাদিগকে যদি তাহা পান করিতে দেওয়া হয় তবে বোধহয় আট আনা Jail Crime কমিয়া যায়। তাহার উপর যদি ভাল খাবার দেওয়া হয় তবে বোধহয় যে পরিবার-পরিজন বর্জিত মানসিক অশান্তি ব্যতীত অনেক অভাব পূরণ হইয়া যাইতে পারে। সামান্য সামান্য অভাব

পূরণ করার জন্য অনেক সময় অনেক ভদ্রলোককেও চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। "বাঙ্গালী তেলে-জলে মানুষ" এ কথা লোকে বলে। সেই বাঙ্গালী যদি শীতকালে একটু তৈল ব্যবহার করিতে না পায় তবে সত্যই তাহার কষ্ট হয়! জেলে সকল জিনিষই আছে; জোগাড় করার সম্বল থাকিলে বুদ্ধি থাকিলে সমস্তই সংগ্রহ হইতে পারে। সুযোগ পাইয়া অভাবগ্রস্থ অবস্থায় লাভের লোভ কেহই ছাড়িতে পারে না। এই সামান্য জিনিষ প্রাপ্তির আশায় অনেক সময় অবৈধ উপায় অবলম্বিত হয়। এই সকল অপরাধের জন্য দণ্ডও পায়। একবার দণ্ড পাইলে তাহার আর লোক-লজ্জার ভয় থাকে না। এই ভাবে নির্লজ্জ হইয়া ক্রমে কচু কাটিতে কাটিতে ডাকাত সাজে। ক্রমে গুরুতর অপরাধ করিতেও সাহসের অভাব হয় না।

জেলে পড়িলে কিরূপে শীঘ্র মুক্ত হইবে সে চেষ্টা সকলেই করে এবং তাহার জন্য গর্হিত কাজ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুই-চার দিবস মাপ (Remission) পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং তাহার জন্য অন্যের ক্ষতি করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। এইরূপ দুই-চার দিবস মাপের প্রলোভন দেখাইয়া জেলের অনেক কাজ করাইয়া লয়। মাসে এক দিবস মাপের জন্য মেথরের কাজ, তিন মাসে দুই দিবস মাপ দিয়া প্রত্যেক রবিবারে কাজ করাইয়া লয়। দশ দিবস Special Remission-এর জন্য লোককে বেত মারিতে বাধ্য করে। পাঁচ টাকা পুরষ্কারের জন্য লোককে যূপকাষ্ঠে ঝুলাইতে উৎসাহিত করে। অনেক সময় কয়েদী এই সকল বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার ফলে তাহাকে কঠিন কাজে দিয়া নির্যাতিত করিতে চেষ্টা করে। যাহার মানসিক শক্তি দুর্বল সে বিবেক অনুযায়ী চলিতে অক্ষম হইয়া অন্যায় কাজ করিতে বাধ্য হয়। যে স্থানে কার্য উদ্ধারের জন্য অন্যায় কাজ করাইয়া লোকের বিবেককে কলুষিত করে সে স্থানে আসিয়া লোকের কোন উপকার হইতে পারে না। সংশোধনের বা উন্নতির কোন আশা করা যায় না। স্বভাব সংশোধনের পরিবর্তে কলুষিত হওয়ার জন্যই পক্ষান্তরে উৎসাহিত হইয়া থাকে। জেলের আইন আছে কোন ষড়যন্ত্রের গোপন খবর জেল কর্তৃপক্ষকে দিতে পারিলে পুরস্কার পাইবে। এই একটা নিয়মের জন্য অনেক সময় ষড়যন্ত্রের তৈয়ারি খবরও জেল কর্তৃপক্ষের নিকট যায়। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ শ্রীযুত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতির আন্দামান নির্যাতন অধ্যায়ে পাঠকগণ পাইয়াছেন। এ-স্থানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীযুত মূলচাঁদ নামে একটি Non-co-operator বন্দী ছিলেন। ইনি কলিকাতার বিশ্বমিত্র নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। সুক্কুর নামে এক পেশোয়ারী একখানা চিঠি লিখিয়া কোন এক ওয়ার্ডারের হাতে দেয়। তাহাতে লিখিয়াছিল "এই লোকের নিকট পাঁচশত টাকা দিবে। আমার অন্যান্য সকল বন্দোবস্ত ঠিক্; এই টাকা পাইলেই কার্য উদ্ধার করিতে পারি।···সুপারিণ্টেডেণ্টকে মারবার জন্য সমস্তই ঠিক।" চিঠিখানা বাংলায় লিখে। ওয়ার্ডারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে এই চিঠিখানা জেলারের হাতে বা Super-এর হাতে দিবে। সেও সেই মতে সুপারের হাতে দেওয়া মাত্রই জেলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তখনই Super আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই সে "নাম বলিতে পারি না, লোক দেখিলে চিনিতে পারিব" উত্তর দিল। আমাদের Bomb ward-এর উপর সন্দেহটা সর্বাগ্রে পড়িল! আমাদের সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া লাইন করাইল। সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের কাহাকেও সনাক্ত করিল না। পরে Non-co-দের ward-এ যাইয়া মূলচাঁদকে দেখাইয়া বলিল "এ লোকই বাহিরে পাঠাইবার জন্য এই চিঠিখানা আমার নিকট দিয়াছে।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে Superintendent Major Salisbury বিবেচক লোক ছিল বলিয়া তাহার বিচারে শ্রীযুত মূলচাঁদ নির্দোষ এবং ষড়যন্ত্রকারী দোষী বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু জেলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে যে কোন রূপের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহার পক্ষে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

প্রত্যেক জেলেই কয়েদীকে শাসনে রাখিবার জন্য মেট-পাহারা থাকে। এ-ভিন্ন আবার জেলারের গুপ্তচরও থাকে। তাহারা বিশেষ কোন কাজ করে না, নামে মাত্র একটা সহজ কাজে নিযুক্ত থাকে অথবা পাহারাওলা হইলে সমস্ত জেলে ঘুরিয়া বেড়ায়। এ ভাবেই উভয় শ্রেণীর লোক নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জেলারকে বা জমাদারকে দিয়া থাকে। গোয়েন্দা বিভাগের কাজটা নিন্দার হইলেও তাহার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। আমরা অনেক সময় এ কাজটার নিন্দা করি। নিন্দা করিলেও আবার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে প্রশংসাও করিতে হয়। নিন্দা করি যখন অন্যে আমাদের গোপনীয় খবর লইতে চেষ্টা করে; আবার প্রশংসা করি তখন যখন অন্যের গোপনীয় খবর গোপনে পাইতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হই।

নন-কো-অপারেশন কয়েদী

আন্দামান হইতে আসিয়াই দুই জন Non-co-operation বন্দীকে দেখিতে পাইলাম। একজন আর্য সমাজি পাঞ্জাবী অপরজন মুসলমান যুক্ত প্রদেশী। তাহাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিবার উপায় ছিল না কারণ তাহারা যে কম্পাউণ্ডে ছিল আমরা সে কম্পাউণ্ডে ছিলাম না। না থাকিলে দোতলার উপর হইতে দেখা হইত। ক্রমে Non-co-operation যতই প্রবল হইয়া উঠিল ততই তাহার প্রধান প্রধান নেতারা জেলে স্থান পাইতে লাগিলেন। বরিশালের শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রামের শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরিদপুরের শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথম জেলে আসেন, ইঁহাদের পূর্ব-পরে কতক স্বেচ্ছাসেবকও আসে। পরে চট্টগ্রামের শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেন, শ্রীযুত মহিম চন্দ্র দাস, শ্রীযুত ত্রিপুরা চরণ রায়চৌধুরী, বাদশা মিয়া আসেন। পরে হেমন্ত সরকার, সুভাষ চন্দ্র বসু, চিররঞ্জন দাস আসেন। তারপর আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চাঁদ মিয়া, আকরাম খাঁ, মজিবর রহমান, পদ্মরাজ জৈন, গর্দে, বাজপাই, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি আসেন। ইঁহাদের পূর্বে-পরে প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক আসে। জেল নন-কো-অপারেশন বন্দী দ্বারা ভর্তি। আমাদের বন্ধনও অনেকটা হালকা হইয়া গেল; তখন আমরা সময় সময় সকলের সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ পাইতাম। আমরা বহুদিন জন-মানবহীন অবস্থায় বাস করিতেছিলাম; আজ এই সহস্রাধিক লোকের মিলনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। এ যাবৎ আন্দামানে থাকিয়া এই আন্দোলনের খবর কেবল মাসিক পত্রে পাইতাম। দৈনিক সংবাদপত্র আমাদিগকে দেওয়া হইত না সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিতাম না। আজ ইহাদের সাক্ষাৎ-দর্শনে দেশের অনেক অবস্থা জানিতে পারিলাম। অতদিন আমরা দেশ ছাড়া হইয়া ছিলাম আজ তাহাদিগকে পাইয়া মনে হইল আমরা বন্দী নহি, স্বাধীন।

বৃদ্ধ-প্রৌঢ়, যুবক-বালক সকলেই বোম ওয়ার্ডের নামের মোহে আকৃষ্ট

হইয়া আসিত ও সকলেই আমাদের দীর্ঘ-কারাবাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইত এবং তাহাদের দুঃখের মাত্রা হ্রাস হইয়া যাইত বলিয়া ভাব প্রকাশ করিত। অল্প বয়সের ছেলেদের মধ্যে যাহারা চার-ছয় মাস জেলে দণ্ড পাইয়া কাতর হইয়া পড়িত তাহারা আমাদের নিকট আসিলে আমরা আমাদের দীর্ঘকাল কারাবাসের অবস্থা বলিয়া সান্ত্বনা দিতাম। যখন কড়াকড়ির বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেল তাহার পর নেতা ও কর্মী সকলেই আমাদের প্রাঙ্গণে আসিয়া আলাপ ও ক্রীড়া করিয়া আমাদিগকে আনন্দে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাদের মধ্যে আবার এমন লোকও ছিলেন যাঁহারা আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকিতে আনন্দ পাইতেন। তাহার মধ্যে শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। কড়াকড়ির বন্ধন ভাঙ্গিলেও আমাদের এখানে কাহারও আসিবার হুকুম ছিল না। তথাপি তাঁহারা চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে আসিতে সক্ষম হইতেন। কর্তৃপক্ষের নিকট ধরা পড়িলে লজ্জিত হইতে হইবে তথাপি তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। ছেলেদের দল অনেক সময় প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আসিত। আমাদের নিকট ছেলেরা আসে বলিয়া আবার নেতাদের কাহারও কাহারও চক্ষুশূল হইল। ছেলেদিগকে আমরা Non-Violence-এর বিরুদ্ধে কিছু বলি বলিয়া তাঁহারা সন্দেহ করিতেন। ছেলেদের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে যদিও বা কেহ কোন কথা বলিত, নেতাদের মুখের উপর জবাব দিবার সাহস না থাকায় চুপ থাকিত এবং কিছুক্ষণ পরেই আসিয়া আমাদের নিকট সব বলিয়া দিত। কেন যে ইহারা আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিত তাহা আমরা বুঝিতাম না। এরূপ ভাবে অনেক লোকের সঙ্গে মেশামেশিতে আমাদেরও যথেষ্ট উপকার হইত একথা স্বীকার করিতেই হইবে। যে কোন লোক একবার জেলে প্রবেশ করিলেই আমাদের গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিত। স্বর্গীয় দাশ মহাশয় জেলে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দিক ঘুরিয়া আসিয়া আমাদের এখানে আসন গ্রহণ করিলেন। যতক্ষণ আমাদের এখানে আসেন ততক্ষণ তাঁহার কোথাও দাঁড়াইবার ইচ্ছা হয় নাই। এখানে আসিয়া তিনি আমাদিগকে যে ভাবে সম্বোধন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন সে ভাবে অভ্যর্থিত হইবার উপযুক্ত আমরা নহি সুতরাং তাহার উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না। এখানে অবস্থান কালে দাশ মহাশয়, শ্যামসুন্দরবাবু, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ঈশানবাবু, আবুল কালাম

আজাদ, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা, মুজিবর রহমান প্রভৃতি সকল নেতার সহিত ভাবের আদান-প্রদান উপলক্ষে অনেক আলাপ হইয়াছে। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া অনেক উপকৃত হইয়াছি। আমাদের দখলের স্থান ছাড়িয়া অন্য কোথাও আমাদের যাবার উপায় ছিল না। সিপাহীদের নিকট হইতে বিদায় পাইলেও আবার Sergeant-দের ভয় আছে। তবে আমরা সময় সময় দাশ মহাশয়ের নিকট যাইয়া তাঁহার অসুখের সময় সেবা-শুশ্রূষা করিবার সুযোগ পাইতাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রকৃত আনন্দ পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সকল কারণের সেরা প্রাণের টান এবং যাহা বলিতেন প্রাণের সত্য কথা। এইটাই আমরা বুঝিয়াছিলাম এবং ইহারই পূর্ণ বিকাশ তাঁহার মধ্যে ছিল। যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা সিংহ বিক্রমের ন্যায় ব্যক্ত করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেন। জেলে গোপনে অল্প দিবস তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া বুঝিয়াছি যে এই একটি খাঁটি বঙ্গমাতার সন্তান। তাঁহার মনের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে অ-প্রকাশ থাকাই ভাল। তিনি যখন যাহা করিতেন তাহা প্রাণ-মন-দেহ দিয়া করিতেন। তাহার এক সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্বদেশ সেবায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা দান। তাঁহার একমাত্র পুত্র যখন ধৃত হইয়া পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়, স্ত্রী-কন্যা যখন ধৃত হইয়া লালবাজার পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত হয় তখন তাঁহার মধ্যে কোন চঞ্চলতা দেখা যায় নাই, বরং মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী প্রভৃতি যখন তাঁদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি জানি এ অবস্থা হবে ; তাহা জানিয়াই পাঠাইয়াছি। আমি যখন অপরের স্নেহের সন্তান-সন্ততিকে দেশের কাজের জন্য আহ্বান করিতেছি তখন আমার কর্তব্য আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সর্বাগ্রে এ বিপদ মাথায় লইতে প্রস্তুত করা এবং শিক্ষা দেওয়া। এ-সকল কাজে তোমাদের বাধা দেওয়া কর্তব্য নহে।" যাক এখানে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ না বলাই ভাল কারণ, তাঁহার গুণের কথা তাঁহার দেশাত্মবোধের কথা কাহারও নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

আমাদিগকে খাওয়াইবার ইচ্ছা সকলেরই ছিল। দাশ মহাশয় সুযোগ পাইলেই ডাকিয়া নিয়া অথবা খাবার পাঠাইয়া দিয়া খাওয়াইতেন। কোন ভাল জিনিষ হইলে অথবা বাড়ী হইতে আসিলে নন-কো-দিগকে না দিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া দিতেন। নৃপেনবাবু, সেনগুপ্ত, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা, পদ্মরাজ জৈন, বসন্তলাল আগরওয়ালা, আজাদ, শাসমল এবং

আরও কয়েকজন বাহির হইতে খাবার ও ফল ইত্যাদি আনাইয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। কেন খাওয়াইতেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

এক সময়ে বহু যুবক এক সঙ্গে দেখিলাম, দেখিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে এই যুবক-শক্তিই প্রকৃত শক্তি। যুবকের প্রাণে বেপরোয়া উন্মাদনা তাহাদিগকে প্রাপ্তির জন্য উন্মাদ করিয়া দেয়, সেই শক্তিই অসাধ্য সাধন করে। এরা যখন প্রায় এক হাজার লোক আসিয়া জেল পুরিয়া ফেলিল তখন তাহারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমস্ত জেলকে মুখরিত করিয়া তুলিল। এটা যে জেল তাহা মনেই হইত না। এটা যেন একটা স্বরাজ আশ্রম। ক্রমে এ আশ্রম পোষ্ট-অফিসেও লোকদের নিকট পরিচিত হইল। অনেকের চিঠিতে শ্রীযুত অমুক, আলিপুর স্বরাজ আশ্রম লিখিয়া দিলে এই জেলের কর্তৃপক্ষদের নিকটেই আসিত এবং সে চিঠি আশ্রমবাসিগণ পাইত। যখন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিটা খুব বেশী হইয়া উঠিল তখন Supdt. নেতাদের সঙ্গে রফা করিয়া তিন বেলা খাবার সময় ধ্বনি করিবার ব্যবস্থা দিল।

একবার এই যুবকদের কাহারও সঙ্গে সিপাহীদের বচসা হয়। সিপাহী তাহাকে ছেলেমানুষ ও নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া চপেটাঘাত করে। এই কথা যেই যুবক মহলে প্রচার হইয়া গেল, অমনি ছেলের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া 'পাগলা ঘুণ্টি' (Alarming Bell) পড়িয়া গেল। গোলমালটা বেশী হওয়ায় এবং প্রায় চার শত যুবক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে মনে করিয়া Superintendent Dr. Ashe তাহার বন্দুকধারি সঙ্গে নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বন্দুক দেখিয়া তাহারা আরও ক্ষেপিয়া গেল। "বন্দুকের ভয়ে আমাদিগকে জয় করিবে?" বলিয়া তাহারা আর তখন non-violent থাকিতে প্রস্তুত রহিল না। Gate-এর দ্বার বন্ধ, তাহারা তখন বাহির হইতে পারিল না নচেৎ একটা ভয়ানক কাণ্ড জেলে ঘটিত। প্রমাদ গণিয়া Dr. Ashe সিপাহীদিগকে দূরে দাঁড়াইতে বলিয়া সেনগুপ্ত, সুরেশবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, হেমন্ত সরকার প্রভৃতিকে ডাকাইয়া যুবকদিগকে শান্ত করিলেন। যুবকগণ ক্ষেপা হইলেও নেতাদের আদেশ পাওয়া মাত্রই তাহারা সুশীল ও সুবোধ বালক সাজিয়া গেল।

আমরা বহুদিবস সভা-সমিতিতে যোগ দেই নাই। একবার সেনগুপ্ত ৺কালীপূজা উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়া আলোচনার প্রস্তাব করেন। আমরা তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না। তিনি Supdt-কে বলিয়া সে দিবস আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবার অনুমতি লইলেন। নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ সভায় আমরা এই প্রথম যোগদান করি। অনেকেই অনেক বক্তৃতা করিলেন, আমরা তাহা শুনিয়া সুখী হইলাম।

আর একবার হেমেন্দ্রবাবুর উৎসাহে 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় হয়। আমার জীবনে এইবারই প্রথম প্রফুল্ল নাটক দেখা হয়। জেলে অধিক দিন থাকার পর এই সকল আমোদ উপভোগটা মধুরই মনে হইল। আর যে সকল ছেলেরা জেলে নবীন-আবদ্ধ তাহারা যেন একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অল্প সময়ের মধ্যে কম্বল ও লৌহের খাটিয়া দ্বারা রঙ্গমঞ্চ যে ভাবে তৈরী করিল তাহা দেখিয়া ছেলেদের উৎসাহের বাহাদুরী দিতে হয়। আর যে সকল ছেলেরা অভিনয় করিল তাহারাও প্রসংসার যোগ্য। বৃদ্ধের মধ্যে হেমেন্দ্রবাবুই ছেলেদের অগ্রদূত। তিনি অনেক নাটকের অভিনয় করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতাও আছে।

নন-কো-দের মধ্যে অনেকেরই Simple imprisonment ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাড়ী হইতে লেখার কাগজপত্র আনিয়া লইত। এ সুযোগে তাহারা অনেকে লেখাপড়া করিত। যাহারা বিশেষ উৎসাহী তাহাদের মধ্যে অনেকে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হাতে লিখিয়া বাহির করিত। ইহার মধ্যে নানারূপ জেল-রাজনীতি থাকিত, অনেক আলোচনা ও সমালোচনার গোপন ও প্রকাশ্য সংবাদ থাকিত। এরূপ আশাতীত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমরা বহু বৎসর পর সামাজিক জীবনের কতকটা আস্বাদ পাইলাম। জেল-রাজনীতি লইয়া অনেক সময় অনেক গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে, যতই হউক না কেন দাশ মহাশয়ের মীমাংসা সকলেই মানিয়া লইত। আর যাহারা মানিত না তাহাদের সংখ্যা নগণ্য, সুতরাং না মানিলেও তাহারা মেজরটির মত অনুসারে নানা কারণে চলিতে বাধ্য হইত।

31st. DECEMBER

দলে দলে যখন non-co-operation করিয়া লোক জেলে আসিল তখন তাহাদের মুখে শুনিলাম ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ লাভ হইবে। ইহা মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যৎ বাণী। যুবকদিগেরও ইহাই বিশ্বাস, বৃদ্ধদিগেরও তাহাই। যখন তাহারা ছয় মাস, এক বৎসর, দুই বৎসরের জন্য জেলে আসিল তখন প্রথম অবস্থায় তাহাদের ইহাই বিশ্বাস ছিল যে 31st. স্বরাজ হইলেই বাহিরে চলিয়া যাইবে। তাহাদের ছয় মাসও জেল ভোগ করিতে

হইবে না। এ বিশ্বাস যে কাহার মধ্যে ছিল না তাহা ধরিবার উপায় নাই। যদিও বা কেহ কেহ অবিশ্বাস করিত কিন্তু majority-র ভয়ে বলিতে সাহস করিত না। কাহারও মুখে সে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠিলে "নাস্তিকের ভগবান প্রাপ্তি হয় না", "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" এই সকল উক্তি প্রয়োগ হয়। ভয়ে ভয়ে দুই-এক জনের সত্য গোপন করিয়া চলিতে হইত। যুবকগণ এই বিশ্বাসের ফল লাভ না করিতে পারিলেও অনেকটা কর্মক্ষেত্রে ত্যাগের আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা এই ভবিষ্যৎ উক্তির উপর এত আস্থা স্থাপন করিয়াছিল যে ইহার বিরুদ্ধ মত কেহ প্রকাশ করিলে Non-violence-এর দিনেও তাহার উপর দণ্ড প্রয়োগের উপক্রম করিত। হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী অল্প সময়ের মধ্যে কোন কাজকে এত আগাইয়া নিয়া যায় যে দেখিয়া মনে হয় ইহা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালী যেমন অল্পায়ু তাহার উদ্যমও তেমনই অল্প স্থায়ী। এই দোষ থাকা সত্ত্বেও ভারতের মধ্যে তাহারা সেরা তাহার কারণ এই যে, তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ দেখাইতে পারে। অসাধ্যকে সাধন করার মত বিশ্বাস সর্বসাধারণের মধ্যে আনিতে পারে, ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়।

এক দিবস নৃপেনবাবু যুবকদিগকে বলিতেছিলেন "বাপুহে! 31st. স্বরাজ হবে এ বিশ্বাস করিও না। স্বরাজ কেহ আনিয়া দিবে এ বিশ্বাসও মনে রাখিও না। 31st.-টাস্ কিচ্ছু না। এটা কেবল কাজ এগিয়ে দেবার জন্য, শীঘ্র লোককে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য এবং কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য একটা ফাঁকা আওয়াজ।" একথা তাঁহার মুখে শুনিয়া ছেলেদের দলও তাঁহার উপর চটিয়া গেল। এরূপভাবে যতই দিন চলিতে লাগিল ততই দেশের নেতাগণ আসিয়া জেল ভরিয়া ফেলিলেন। বাহিরের কাজকর্ম ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল; ছেলেদের বিশ্বাসও টলমল করিতে লাগিল। যতই 31st. ঘনিয়া আসিল ততই বিশ্বাস নষ্ট হইতে চলিল। 31st.-এর একমাস পূর্বেও লোকের বিশ্বাস ছিল যে 31st. স্বরাজ হবেই হবে। এক দিবস আমরা ডাঃ সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে 31st. স্বরাজ হবে? তিনি বলিলেন, "হাঁ আমার বিশ্বাস 31st. স্বরাজ হবে।" অপর দিবস আবুল কালাম আজাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম স্বরাজ সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস কি? তিনি বলিলেন "31st. স্বরাজ হবে

এরূপ ধারণা করা ভুল। তবে স্বরাজের কাজ তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে দিবে মাত্র কিন্তু প্রকৃত স্বরাজ হবে না। স্বরাজ লাভের জন্য যতখানি আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন আমাদের এ-কাজ তাহার কোন প্রমাণ দেয় না।" তিনি একটা আরবী শ্লোক আওড়াইয়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করিলেন।

31st. যখন দেখা দেয়-দেয় অবস্থা তখন বালক-যুবক প্রভৃতি সকল বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে কালিমা পড়িবার উপক্রম হইল। বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল। বড় আশার জিনিষ হঠাৎ নষ্ট হইয়া গেলে দুর্বল চিত্তকে অধিকতর দুর্বল করিয়া দেয়। আবার যাহাদের সঙ্কল্প দৃঢ়, যাহারা শক্ত তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির ভাব অধিকতর দৃঢ় হয়। 31st. যখন পার হইয়া গেল, তখন সকলের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে অনেকের মন ভাঙ্গিল আবার কাহারও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বাড়িয়া গেল। এই সময়ে ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সকলেই আকুল। 'কি করা যায়' ভাবিয়া নেতারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিল। সকলে একমত হইতে পারিল না বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হইল। ক্রমে ইহা বাড়িয়াই চলিল। এই গোলমালের মধ্যেই যাহারা "একটা কিছু করিবেই করিবে" ভাব হৃদয়ে পোষণ করিত তাহারা "যাহা হয় বাহিরে যাইয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিব" বলিয়া চুপ করিল। আর যাহারা কাজে কিছু করিবে না, অথবা বাহিরে যাইয়া পিছ-পাও দিবে তাহারা বৃথা নানা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। এই অবস্থার পর দলাদলিটা একেবারে পাকা হইয়া উঠিল। আমরা এখানে দ্রষ্টা ও শ্রোতা মাত্র। অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, অনেক বুঝিলাম। ইহার মধ্যে যাহারা চিন্তাশীল তাহারা "বোবার শত্রু নাই" পথই অবলম্বন করিল। এই দলাদলিটা যে বাহিরে দেখা দিবে এ ধারণাও কেহ কেহ করিলেন। এ অবস্থাতে এক পুরুষ সিংহের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকৃত কর্মিগণ সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া চলিল। এখানে এমন সব কথাও হইত যে দাশ মহাশয়কে Congress হইতে তাড়াইতে হইবে।

এখানে আসিয়া কেহ-বা উপকৃত হইয়াছে আবার কাহারও-বা পতন হইয়াছে। এখানে ডাঃ সুরেশবাবু গীতা ক্লাস করিতেন, শ্রীযুত কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় মহাভারতের ক্লাস করিতেন। কালিকাবাবু মহাভারত ক্লাসের জন্য গ্রন্থের সাহায্য লইতেন না। আর তিনি বক্তৃতা

প্রসঙ্গে বাল্যশিক্ষার পদগুলির এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন যে তাহা শুনিয়া সাধারণ লোকের অনেক উপকার হইত। যথা দৈ নাই খৈ খাই অর্থাৎ দেশে গরুর অভাবে দুগ্ধের অভাব, দুগ্ধের অভাবে দধির অভাব। এই অভাবে পড়িয়াই শুধু 'খৈ' খাই। ইহার পর আবার ইহার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। ইংরেজ ম্লেচ্ছ সুতরাং সে তাহার সেনাদের জন্য গো-মাংসের ব্যবস্থা করে। সে কারণেও অনেক উপযুক্ত গরু নষ্ট হয়। আর মুসলমানগণ গরু কোরবাণি দিয়া থাকে সে কারণেও গরুর অভাব হয়। এই সকল কারণেই আমাদের আজ শুধু 'খৈ' খাইতে হয়। বাল্যশিক্ষা হইতে তিনি বাস্তবিকই সুধা বাহির করিয়াছেন, তিনি Non-Co-operation movement সময়ে সাধারণ লোকের নিকট শুধু এই সকল ভাবেরই উপদেশ বক্তৃতা প্রসঙ্গে দিতেন। তাহাতে লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন।

বহু লোকের মিলন না হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত হবে না একথা সকলেই বুঝে। হিন্দু-মুসলমানের একতা না হইলে দেশের স্বাধীনতার অন্তরায় ইহাও জানে। অনেকেই এ-মিলনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মিলন হইয়াও হইতে পারে নাই। হিন্দু-মুসলমানে এক পাতে খানা খাইয়াছে কিন্তু তাহাতেও মনের মলিনতা দূর হয় নাই। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা গোঁড়া তাহারাও অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তথাপি মিলনের পথ সহজ হয় নাই। এক পাতে খাইলে, এক সঙ্গে কাজ করিলে, দুর্ভিক্ষের সময় এক পাতে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে খাইলে পুরীধামে যাইয়া একের হাতে অন্যে ভোজন করিলে মিলন হয় না। মিলন যদি সত্যই লাভ করিতে হয় তবে মনের সঙ্কীর্ণতা অনুদারতা দূর করিয়া প্রাণের টানে টানে বাঁধা থাকিতে হয়, জাত্যাভিমান বিসর্জন দিতে হয়। তাহা না হইলে সঙ্ঘবদ্ধ জাতি গঠনের আশা সুদূর পরাহত। স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" আমরা যতই এক পাত্রে বসিয়া ভোজন করি না কেন যতদিন আমাদের মনে এই ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সত্য হইয়া ফুটিয়া না উঠিবে জাতি ভেদের কঠোরতা যতদিন থাকিবে ততদিন সঙ্ঘবদ্ধতা সম্ভব হইবে না, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা স্বপ্ন মাত্র।

স্পেশাল ক্লাস

আন্দামানে থাকিবার সময়ই আমরা জেল কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হাওয়ার কথা জানি। কমিটি যাহা সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছে তাহাও ওখানে পাঠ করিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনও করিয়াছে। আমরা নন-কো-অপারেশন বন্দিগণ জেলে আসার পূর্ব হইতেই শুনিতেছিলাম আমাদের জন্য বারো শত টাকা মঞ্জুর করিবে। কেন কি উদ্দেশ্যে করিবে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। এই সকল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে নন্-কো বন্দিগণ আসিয়া জেল পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পর এক Circular আসিল অমুক-অমুককে মাসিক পনেরো টাকা হিসাবে খাবার দেওয়া হউক এবং তাহাদিগকে Special class prisoner করা হউক, এই আদেশ অনুসারে জেল কর্তৃপক্ষ কাজ করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু আমাদের পক্ষ হইতে আমরা আপত্তি করিয়া জানাইলাম যে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই, কারণ এই আদেশ মতে বহু নন-কো-অপারেশন বন্দী বাদ পড়িয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা Special class হইল তাহারাও বলিল যে আমাদের সকলকে Special class না করিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব না। এই প্রতিবাদের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ডাঃ সুরেশবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, সেনগুপ্ত, নৃপেনবাবু, হেমন্ত সরকার প্রভৃতি। আমাদের এই প্রতিবাদ Superintendent Government-কে জানায়; Government বিবেচনা করিয়া পরে আবার আদেশ দেয় যে সকল রাজনৈতিক বন্দীকেই Special class করা হউক। ইহার পর Special খানা আরম্ভ হইয়া গেল, সকলেরই দুঃখ অনেকটা কমিয়া গেল। প্রথম অবস্থায় সকলেরই পাক একসঙ্গে হইতেছিল কিছু পরে মুসলমান-জাত্যাভিমান বাড়িয়া যাবার পর তাহারা তাহাদের পাক ভিন্ন করিয়া নিল। যখন তাহারা পৃথক করিয়া নিল তাহার পরে শিখগণ পৃথক হইল।

এই শ্রেণীর বন্দিগণ অপর সকলের অপেক্ষা কতকগুলি বেশী সুবিধা পায়। আমরা কাপড়-জামা, ভাল কম্বল প্রভৃতি পাই অপর সকলে তাহা পায় না। কাজ-কর্ম সম্বন্ধে তেমনি হালকা মোটের উপর জেল অনেকটা সহজ মনে হয়। কিন্তু এই ভাবে জেলটা বেশী দিন কাটাইতে পারি নাই। প্রথম বয়সে দুঃখ করিলে শেষ জীবনে সুখ হয়। আমাদের অবস্থাও তাহাই হইল।

বরিশালের শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত ইচ্ছা করিয়া হন

নাই। তাহাকে এইরূপ খাবার দেওয়া হইয়া ছিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া সাধারণ কয়েদীদের খাদ্যই খাইতেন। তিনি বলিতেন, 'এই যে হাজারাধিক লোক যাহারা আমার ভাই, যাহারা আমার দেশের লোক তাহাদিগকে ফেলিয়া আমি চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ করিতে পারি না। আমার হৃদয় তাহা চায় না। কাজে কাজেই আমি ইহা ভোজন করিতে পারিব না।' ইহার পর বরিশালের সতীন্দ্র সেন আসিলেন। তিনিও এই কথা বলিয়াই সাধারণ কয়েদীর খাবার খাইতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া সাধারণ কয়েদীরাও মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে আমরা এই ব্যবহার পাইলে তাহারা কেন পাইবে না। এই সকল আলাপ-আলোচনা চলিবার পর ইহা ক্রমে কর্তৃপক্ষের নিকট ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। এই কারণে ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু না হয় সে জন্য কর্তৃপক্ষ সাধারণ কয়েদীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। পূর্বাপেক্ষা তাহাদের খাবারটা ভাল করিয়া দিল। তথাপি তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। দিন দিন সকল কয়েদী ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদিন তাহারা সকলে আহার ত্যাগ করিয়া ধর্মঘট করিয়া বসিল। প্রথম দিবস তাহাদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া খাবার খাইতে বলিল কিন্তু তাহারা খাইল না। বরং কেহ তাহাদের নিকট গেলে পর মারপিট করিতে প্রস্তুত হইত। বেল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জমাদারদিগের প্রতি বেল ফল ছুড়িত। দ্বিতীয় দিবস তাহাদের জন্যে ভাল খাবার প্রস্তুত করিল তাহাতেও তাহারা রাজি হইল না। যাহা তৈয়ার করিল পূর্বাপেক্ষা ভাল হইলেও ভাল বলা যায় না। সেই দিবস তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক নম্বর হইতে এক একজন করিয়া প্রতিনিধি জেলারের আদেশমত তাঁহার নিকট যাইয়া তাহাদের সকল দাবী জানাইল। তৃতীয় দিবস তাহাদের জন্য মাংস, ডাল, তরকারী, মৎস্য ভালরূপ তৈয়ার করিল। তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই ভোজন করিল। সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া এখন গোলমালের গোড়ায় প্রধান উদ্যোগী কে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল। প্রলোভন দেখাইয়া কয়েকজন একরারী বাহির করিল এবং তাহারা সকল গোপন খবর দিয়া কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিল। সকলের মধ্য হইতে তিন জন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এক জনকে বিশ বেত, এক জনকে পনের বেত এবং অপর জনকে দশ বেত দিয়া কুঠিবন্ধ করিল। এক ঘা-তেই সকলে সোজা হইয়া গেল। ইহার ফলে পূর্বাপেক্ষা ডাল-ভাত-তরকারীর কিছু

উন্নতি হইল। কিছুদিন চৌকার management নন-কো-দের হাতে ছিল। সে সময় জিনিষপত্র বিশেষ চুরী হইত না সুতরাং খাদ্য দ্রব্যের উন্নতি তখন হইতেই অনেকটা হয়। আবার যখন জমাদারদের হাতে আসিল তখন পুনরায় খারাপ হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পরেই সাধারণ কয়েদীরা ধর্মঘট করে।

নন-কো-দের আসার পর জেলের অনেক উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কর্তৃপক্ষ কয়েদীদিগের উপর অত্যাচার করিতে কখনও সাহস পাইত না। এক দিবস ঘানিঘরে কোন এক কয়েদীকে প্রহার করে, তাহারা তাহা দেখিয়া প্রতিবাদ করে এবং প্রহারকারীদের ভয় প্রদর্শন করে। এ সংবাদ Supdt-কে জানায়, ইহার পর হইতে আর ঘানিঘরে কোনরূপ নির্যাতন হইত না। সমস্ত জেলময় রাজনৈতিক বন্দী। কোথাও কোন গোলমাল হইলে, অন্যায় হইলে সাহেবের কানে যাবে এই ভয়ে জমাদার প্রভৃতি সর্বদা সাবধান থাকিত এবং জেলার প্রভৃতির মুখও বন্ধ থাকিত। স্বেচ্ছামত জেল শাসন করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে Annual Jail administration Report-এও Govt. বলিয়াছে যে রাজনৈতিক বন্দিগণ জেলে থাকিলে জেলের সুশাসন ভালরূপ চলিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের জন্য পৃথক জেল হওয়া ভাল। Sir Abder Rahim যখন জেলের executive officer ছিলেন তখন মুসলমানদিগের জন্য জেলের অনেক পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তাহাদের নমাজের সুবিধা, জুম্মা-নমাজের দিনে বাহির হইতে মৌলবী আসিবার ব্যবস্থা, নমাজের জন্য লম্বা জাঙ্গিয়া ব্যবহারের আদেশ ইত্যাদি ইত্যাদি কতকগুলি পরিবর্তন তিনি স্বেচ্ছায়ই করিয়া থাকেন। তিনি যখন একজন সর্বময়কর্তা ছিলেন তখন ইচ্ছা করিলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই কিছু করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

ভারতীয় জেল

(অসহযোগ আন্দোলন)

এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় পনের হাজার স্বরাজ সাধক বন্দী। প্রথম ইহাদিগকে বন্দী করিয়া সরকার বুঝিতে পারিল যে শুধু কর্মীদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। ক্রমে সকল নেতাকেই অল্প-বেশী সময়ের জন্য জেলে আবদ্ধ করিল। সর্বশেষে

দেশবন্ধু দাশকেও ছয় মাসের জন্য আবদ্ধ করিল। ইহাদিগকে কারার লৌহ দ্বারের ভিতর পুরিয়া যখন বুঝিতে পারিল যে আর মাথা উঠাইবার মত লোক নাই তখন কর্মীদের মধ্য হইতে অনেক যুবককে তাহাদের নির্দিষ্ট কারাবাস শেষ না হইতেই মুক্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিবস পূর্বে মুক্ত হইত আবার জেলে চলিয়া আসিত। তখন তাহাদিগকে চালাইবার মত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার মত লোক বাহিরে ছিল। এবার সেরূপ লোক নাই বলিয়া তাহারা আর মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল না। তাহারা বিবাহের বরযাত্রীর ন্যায় আসিল, আবার দুই দিন পরেই চলিয়া গেল। সকলেই ১৯২১ সালের 31st ডিসেম্বর স্বরাজের আশায় সমস্ত শক্তি দিয়া কাজ করিয়াছে, আজ তাহারা সে আসায় জলাঞ্জলি দিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ঘরে ফিরিল।

মুক্তির সন্ধান

বহু বৎসর যাবৎ জেলে বাস করিতেছি। অনেক দিবস কাটিয়া গেল। এখন বন্দীজীবনের শেষকাল উপস্থিত। পূর্বে বলিয়াছি যে যখন আন্দামানে যাত্রা করি তখন ফিরিয়া আসিবার আশা ত্যাগ করিয়াই গিয়াছিলাম। দেশে যখন ফিরিয়া আসি তখন অর্ধাংশের অধিক কাটিয়া গিয়াছে। আসার পর অনেকটা ভরসা হইয়াছিল যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিব। ক্রমে দিনগুলি আরও ফুরাইয়া আসিল তখন আশার উপর ভরসাও হইল। এবার হইতে মুক্তির সন্ধান পাইতে চেষ্টা করিলাম। আন্দামানে থাকার কালে কোনরূপ Remission পাইতাম না। এখানে আসিয়া মাসে তিন দিবস করিয়া তাহাও পাইতে লাগিলাম। তাহাতে মুক্তির দিনগুলি আরও ঘনাইয়া আসিল। এবার হিসাব করিয়া দেখিলাম যে এই হিসাবে Remission পাইলে কতদিন পর মুক্ত হইতে পারি। আন্দামানে যখন ছিলাম তখন পিতার মৃত্যু সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগ্নী প্রভৃতি সাত জনের মৃত্যু সংবাদ পাই; ইহার পর আমি এখানে আসিয়া মাতৃহীন হই। মাতা-পিতা ব্যতীত আর যাহারা পরলোক গমন করিয়াছে তাহারা সকলেই আমার বয়ঃকনিষ্ঠ। এসব কথা যখন মনে আসিত তখন মুক্তির নেশা ছুটিয়া যাইত।

এই সন্ধান পাইয়া এখন হইতে মাস গণিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে দিন আরও ঘনাইয়া আসিল, মুক্তিতে বিশ্বাস জন্মিল। জীবনের উন্নতির

প্রথম অবস্থায়, লেখাপড়ার শেষ অবস্থায় 'কি করিবে' এই প্রশ্ন যেমন লোকের মনকে অস্থির করিয়া তোলে, তেমনই এই দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মাতৃ-পিতৃহীন অবস্থায় বাহিরে যাইয়া কি করিব এ প্রশ্নও আমাকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। মুক্তির সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু সম্বলের সন্ধান না পাইলে চলে না, সে জন্যই স্বাভাবিক ভাবেই এই সকল চিন্তা মনে আসিয়া উপস্থিত হইত। এ সময়ে Convict mentality মুক্তির পূর্বে যে কেমন হয় তাহা বুঝিবার অবসর পাইলাম।

যতদিন মুক্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না ততদিন বেশ শান্তিতে থাকা যায়। যখন যেমন তখন তেমন, যথা বাস তথা ভবন থাকে মনের অবস্থা। মুক্তি ঘনিয়া আসিলেই স্থির চিত্তকে অস্থির করিয়া তোলে। কেন করে তাহা বুঝা বড় শক্ত। আমার একটা মনে হয়; বহু দিবস জেলে আবদ্ধ থাকিলে মনের অবস্থা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং সমাজের সংস্রবহীন অবস্থায় বাসের পরিণামে এমন হয় যে হঠাৎ সেই সকল সম্বন্ধের আশায়, দুঃখের পর হঠাৎ সুখ লাভের সম্ভাবনায় মানসিক শক্তিকে তোলপাড় করিয়া তোলে। আর একটা মনে হয় হঠাৎ স্বজনের সঙ্গে দেখা হইবে এই অচিন্ত্যনীয় অব্যক্ত আনন্দের ভবিষ্যৎ ভাবনায় মনকে অতিরিক্ত আনন্দপ্লুত করিয়া তোলে বলিয়া চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ শেষকালে যখন অল্প দিবস বাকী থাকে তখন দিনগুলি যেন শীঘ্র কাটে না, রাত্র যেন ভোর হয় না এমন একটা অবস্থা হয়। ইহা যে স্বেচ্ছায় মনে স্থান দেওয়া হয় তাহা নহে। ভবিষ্যৎ চিন্তার ফলে ইহা মনে আসে। ভবিষ্যতে একটা কিছু করিতে হইবে, কি করিতে হইবে তাহা অনেক পূর্বেই ঠিক আছে। সেটা যাহাতে শীঘ্র করিতে পারি; কখন বাহির হইব, কখন উহা করিবার সুযোগ পাইব এই চিন্তাটাই মনকে অস্থির করিয়া তোলে এবং তাহার ফলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আর একটা ইহার উল্টা। কি করিবে ইহার স্থিরতা নাই।

এতদ্ভিন্ন সাধারণ কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি যে মুক্তির পূর্বে মনের অবস্থা কেমন হয়। তাহারাও এই একই কথা বলিয়া থাকে। তাহারা একমাত্র বলে যে, দিন যেন কাটে না, এক একটা দিন যেন সপ্তাহ বলিয়া মনে হয়। যাহার পাঁচ বৎসর দণ্ড তাহার চার বৎসর কাটিতে যে মানসিক কষ্ট হয় নাই, শেষ এক মাস শেষ করিতে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়! তাহা কেন হয়, কিসের জন্য মনের অবস্থান্তর হয় তাহার হিসাব-

নিকাশ করিয়া উপসংহার ঠিক করিতে পারে না, বিশেষ করিয়া তলিয়ে দেখিতে পারে না কেবল উপলব্ধি করে মনের অবস্থান্তর অবস্থা। মনো-বৈজ্ঞানিক এই লক্ষণগুলি হইতে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যথিতের বেদন বুঝা শক্ত।

মুক্তির পূর্বাবস্থা

ভারতীয় জেল-আইন অনুসারে আন্দামান অপেক্ষা দেশী জেলে শ্রম বেশী করিতে হয় বলিয়া এখানে মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ দণ্ড লাঘব করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। লাঘব করিয়া দিলেও এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না যে অবশ্যাই লাঘব হইবে। আমাদের সম্বন্ধেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। অনেক দিবস হয় এ-জেলে (আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে) আসিয়াছি। অনেকেই আসে-যায়, দেখা করে এভাবে প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন একটা confidential চিঠি আসে। তাহাতে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতীয় জেলে আসার পর অবশিষ্ট দণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিয়া দেওয়ার কথা থাকে। আমাদের এই সকল ঘটনা নিয়া অনেক লেখাপড়া চলিয়াছে তাহা আমরা জানি না এবং আমাদের টিকেটেও কিছু লিখে না। আমরা অনেক পীড়াপীড়ি করার পর কিছু না লিখিয়া এক-তৃতীয়াশ কমাইয়া আমাদের মুক্তির তারিখটা কিছু পূর্বে করিয়া দিল।

মুক্তির পূর্ব দিবস পর্যন্ত কোন সংবাদ নাই। তখন মনে করিলাম সামান্য কয়টা দিন না পাইলেও ক্ষতি নাই। এরূপ ধারণা হবার একটা কারণও ছিল। এই সময়ে আমি হাসপাতালে ছিলাম। তখন শ্রীযুত ত্রৈলোক্যবাবু হাঁপানি রোগে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রুষার জন্য আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম। যাঁহার সঙ্গে সুখে-দুঃখে বহু বৎসর এক সঙ্গে দিন কাটাইয়াছি, সময়-অসময়ে সুখের-দুঃখের আলাপ করিয়া মনের শান্তি পাইতাম আজ তাঁহাকে রুগ্ন শয্যায় রাখিয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। বরিশালে আমরা পাঁচ জন যখন এক সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বাস করিতেছিলাম তখন তিনি ছিলেন আমাদের আনন্দের স্তম্ভ। তিনি একাধারে গম্ভীর ও রসিক। তিনি যখন ছেলের সঙ্গে মিশেন তখন ছেলে, যখন যুবকের সঙ্গে মিশেন তখন যুবক আবার যখন বৃদ্ধের সঙ্গে মিশেন তখন বৃদ্ধ। তাঁহার সর্ব বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা। লোকে বলে ধৈর্যের সীমা আছে কিন্তু তাঁহার

ধৈর্য অসীম। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত দিন আমরা নানারূপ রসিকতা আমোদ-কৌতুক করিতাম কিন্তু কখনও তিনি ধৈর্যহীন হইতেন না। তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া সকলেই আনন্দ পাইতাম বলিয়া প্রতুলবাবু রসিকতা করিয়া গান রচনা করিতেন। সময় সময় কীর্তনের সুরে বেশ সুন্দর করিয়া গাহিতেন—

যদি মহারাজ* না আসিত কেমন হইত
আনন্দে রাখিত কে ;
চিমটি খোঁচা দাড়ি ধরে টানা বলনা
সহিত কে।"

এইরূপ চির সহচর, চির বন্ধুকে ছাড়িয়া যাইতে মনটা খারাপ হইয়া গেল।

হিসাব অনুসারে যে দিবস মুক্তির দিন, সে দিবস প্রাতে Supdt আসিয়া বলিলেন "We have got order from the Government to transfer you in Dacca jail to-day" (তোমাকে অদ্য ঢাকা জেলে যাইতে হইবে)। আমি বলিলাম What is about my release ; is there any information about it ? (আমার মুক্তি সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইয়াছ কি ?) Supdt বলিল sorry nothing only thing I know that the Govt. will communicate about it there (দুঃখিত কিছুই না। তাহারা এ সম্বন্ধে ওখানে জানাইবে এই পর্যন্তই জানি)। তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া আমাদের বোম ওয়ার্ডে আসিয়া নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলাম। পরে আবার হাসপাতালে যাইয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া আহার শেষে নিজের ওয়ার্ডে আসিয়া এখানে সকল বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়া শেষ বক্তব্য শেষ করি।

সকলেই আমার মুক্তির আশায় মুখে হাসি, চোখে জল নিয়া আমাকে বিদায় দিল, আমিও অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বিদায় লইলাম।

১৯২৪ সালের ১২ই আগষ্ট বৈকাল ৬ ঘটিকার সময় আসিয়া অফিসে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন পর কলিকাতা সহরের দৃশ্য দেখিতে পাইবার আশায় উদ্‌গ্রীব। পুলিশ প্রহরীগণ আমার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া ঘোড়ার গাড়িতে শিয়ালদহ ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিল। সে সময়ে

---

* ত্রৈলোক্যবাবুকে আমরা সকলেই মহারাজ বলিয়া ডাকিতাম। এই নামে পরে সকলের নিকটই পরিচিত।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল। অন্ধকার আকাশের ছায়ায় লোকজনহীন রাস্তার মধ্য দিয়া গাড়িখানা সন্ধ্যার সময় আসিয়া শিয়ালদহ পৌঁছিল। আমাকে দেখিয়া অনেক লোক সমবেত হইল। সকলেরই ধারণা ছিল নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাকে ঘেরাও করিয়াছে। মাঝে দুই-এক জন আলাপ করিয়া যখন জানিতে পারিল যে আমি তাহা নই তখন আলাপ করিবার জন্য লোকের ঐকান্তিকতা বাড়িয়া গেল, ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। জনতা যখন ঘন হইয়া আসিল তখন পুলিশ ভয়ে জনতা ভাঙ্গিয়া দিল এবং আমাকে পরে ভিতরের platform-এ নিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পর গাড়িতে আরোহণ করিলাম। পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িল।

রাত্রি ভোরে ১৩ই আগষ্ট গোয়ালন্দ আসিয়া পৌঁছিলাম। পরে জাহাজে inter class-এ প্রবেশ করিলাম। নদীবহুল দেশের লোক আমরা। অনেক বৎসর যাবৎ নদী চোখে দেখি নাই। আজ বর্ষার ভরা পদ্মাবক্ষ দেখিয়া আনন্দে বুক ভরিয়া গেল। যত দেখি ততই দেখিবার ইচ্ছা হয়। এ-ভাবে এক ঘণ্টা চলিয়া গেল। অনিমেষনেত্রে একবার এ-দিক একবার ওদিক দেখিতেছি হঠাৎ প্রহরী আসিয়া বলিল "বাবু কুছ খায়েগা নেহি ?" তখন আমার চৈতন্য হইল যে আমি বন্দী। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ শেষ করিয়া আবার আসিয়া বসিলাম। তখন সকলেরই শ্রান্তি ভাঙ্গিয়াছে। ক্রমে দুই-এক জন আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ক্রমে কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেশের সংবাদ লইলাম। আমার সংবাদ সমস্ত যাত্রীর মধ্যেই কানাকানি হইতে লাগিল। এই যাত্রীদের মধ্যে আমার এক পিসতুত ভাই শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে এক পিসতুত ভগ্নীও ছিল। তাঁহারা এই সংবাদ পাইয়া অনতিবিলম্বে উন্মাদের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তাঁহারাও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রথম চিনিতে পারেন নাই, তবে আমার সঙ্গে প্রহরী আছে বলিয়া অনুমান করিয়া লইলেন। কে যে কি ভাবে কথা আরম্ভ করিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। প্রথম আমিই কথা আরম্ভ করি। কোথায় গিয়াছিলেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন ইত্যাদি ভাবের আলাপ করিবার পর ক্রমে নানা-রূপ আলাপ করিলাম এবং বাড়ীর সকল সংবাদ পাইলাম।

নারায়ণগঞ্জ আসিয়া জাহাজখানা তীরে সংলগ্ন হইবার পর তাহাদের মনে চঞ্চলতা দেখিলাম। বহু দিবস পর দেখা হবার পর তাহারা আমাকে

ছাড়িয়া যাইতে চায় না। কি করিবে বাধ্য হইয়া বিদায় লইতে হইল। পূর্ব পরিচিত নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে ভিতরের platform-এ নিয়া বসাইল। যুবকশ্রেণী আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। আমি কাহাকেও চিনি না তথাপি তাহারা যেন আমার এ-অবস্থা দেখিয়া কাতর হইল। জনতার মধ্যে আমার পরিচয় প্রকাশ পাইল।

Dacca mail-এ ঢাকা আসিয়া পৌঁছিলাম। এখান হইতে আবার শকটারোহণে ঢাকা জেলে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঢাকা জেলের অফিসে পৌঁছামাত্রই আলিপুর জেলের পরিচিত একজন এসিস্টেণ্ট জেলারকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ করার পর এ-জেলের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। অফিসে আসিতেছি ইহার সংবাদ তাহারা পূর্বেই পাইয়াছে। কোথায় থাকিতে হইবে তাহাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথম যখন ধৃত হই তখন এ-জেলে কয়েক মাস বাস করি। তখন ছিলাম ৪০ ডিগ্রীতে। এবার নিয়া আসিল ৮ ডিগ্রীতে। সমস্ত জেলের মধ্যে এ-স্থানই সর্বাপেক্ষা খারাপ। অফিস হইতে বাহির হইয়া জেলের ভিতরে প্রবেশ করিবারকালে পরিচিত জেলারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা আমার মুক্তির কোন খবর রাখেন কি ? উত্তর পাইলাম 'না' একবার মনে হইয়াছিল যে ঢাকায় নিয়া হয়ত ছাড়িয়া দিবে। এখানের উত্তর পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে যাইয়া ৮নং ডিগ্রীতে স্থান লইলাম। এখানে স্নান করিয়া বসিয়া একটা ওয়ার্ডারের সঙ্গে আলাপ করিয়া এখানে কোন স্বদেশী কয়েদী আছে কিনা সংবাদ লইতেছি এমন সময়, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে একজন জমাদার আসিয়া বলিল 'আপ যায়গা, আপিসমে চলিয়ে" আমি একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া রহিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "কিধার যায়গা' উত্তর পাইলাম "বাহার যায়গা" আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 'ক্যায়া ছুট যায়গা' উত্তর পাইলাম 'জি', এবার কিছুটা বিশ্বাস হইল। অফিসে গেলাম যাওয়া-মাত্রই পুরাতন জেলারটিকে দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, এই কলিকাতা মেলে আপনাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অর্ডার পাইয়াছি। এই সংবাদ পাইয়া মনে ব্যস্ততার উদয় হইল। এতদিন কিছু বুঝিতে পারি নাই। আজ প্রকৃতই বুঝিলাম যে মুক্তির সময়ের পূর্বে মুক্তি আসার যন্ত্রণা কি ! মনটা বড়ই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

জেলারের হিসাব-নিকাশ চলিতে লাগিল, এদিকে থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। হিসাবে দেখা যায় যে আড়াই মাস বেশী খাটা হইয়াছে। আন্দামানে

যাবার পূর্বে যে কয়মাস বাঙ্গলার জেলে ছিলাম তাহার এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিলে বেশী খাটা হয় কিন্তু তাহা আলিপুর জেলে ধরে নাই বলিয়া উভয় জেলের হিসাব এক হইল না। ইতিমধ্যে থানা হইতে inspector আসিয়া গেল। তাহার সঙ্গেও কোথায় যাব কোন বাসায় থাকিব ইত্যাদি আলাপ চলিতে লাগিল। আলাপ প্রসঙ্গে বলিলাম, "কোন বাসায় গেলেই তো আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহারা। এক্ষেত্রে স্থির করিয়াছি যে আপনার বাসায় গেলেই বন্ধুবান্ধবরা নিরাপদ।" জিজ্ঞাসা করিলাম "রাজি আছেন তো?" অমনি হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে আমাকে মাপ করিবেন' বলা মাত্রই সকলের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে সাতটা হইয়া গিয়াছে। পরে স্থির করিলাম রাত্রিকালে শ্রীযুত শ্রীশবাবুর বাসায়ই যাইয়া উঠিব। এখান হইতে phone করিয়া সুত্রাপুর থানায় জানাইল যে "শ্রীশবাবুর বাসায় যাইতেছে।" তখনই বুঝিলাম যে পিছনে 'ফেউ' লাগিবে।

রাত্রি আট ঘটিকার সময় বিদায় লইয়া আস্তে আস্তে একখানা জামা ও কাপড় এবং এক জোড়া খড়ম লইয়া বাহির হইয়া তমসাবৃত রজনীর ক্রোড়ে স্থান লইলাম। বাহির হইয়া অবাক হইয়া গেলাম। মাথার অবস্থাটা যেন কেমন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। কি করিব স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কেন যে এমন হইল সে মনস্তত্ব আজও বুঝিতে পারি নাই। inspector-টি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হাঁটিয়া যাবেন, কি গাড়িতে যাবেন? দেখিলাম চলিতে পা আটকায় এমন অবস্থায় গাড়িতে যাওয়াই স্থির করিলাম। inspector একখানা গাড়ি ডাকিয়া আনিবার জন্য একটা লোককে আদেশ করিল। একখানা গাড়ি আসিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীশবাবুর বাসা চিনিবেন তো? আমি বলিলাম, চিনিব। তথাপি গায় পড়িয়া নিজ হইতেই বলিল, এরাও ঐদিকেই যাবে সঙ্গে নিয়া যান আপনাকে বাসা চিনাইয়া দিবে। আমি বলিলাম, দরকার নাই। তথাপি তাহারা আমার সঙ্গ লইল। তখনই মনে হইল এরা বোধহয় পুলিসের গুপ্তচর। তাহাদিগকে সঙ্গে দেবার উদ্দেশ্য এই যে আমি ঠিক ঠিকই শ্রীশবাবুর বাসায় যাই, না সে বাসার কথা বলিয়া অন্য কোথাও যাই, ইহা জানা।

যিনি আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যাঁহার সাহায্যে আপদে-বিপদে রক্ষা পাইয়াছি, যিনি প্রথমবার মুক্ত করিয়াছিলেন, বহু বৎসর পর আবার তাঁহারই গৃহে আশ্রয় লইয়া মুক্ত হইলাম।

॥ সমাপ্ত ॥